হিন্দুত্ব ও তার কাম্য বিরোধী

'যেন তা কল্যাণ সত্য চায়, তবু আঁধার হিংসার
রিরংসার পাকে ঘুরে ঘুরে ঘুরে শূন্য হয়ে যায়'

রাষ্ট্র আর প্রগতি 'শুদ্ধ' করতে নাৎসি ক্যাম্প, 'মানব মুক্তির' জন্য নাৎসি ক্যাম্পের সমাজতান্ত্রিক প্রতিরূপ গুলাগ কি প্রযুক্তির সাফল্য মাপতে ঠাণ্ডা মাথায় হিরোশিমা, নাগাসাকি না মানুষের অতীত বিকার না তার লুপ্ত তন্ত্রসাধনা। জীবন জুড়ে হিংস্রতা আর তিমির বিলাস যেন আজ তার অস্তিত্বের শর্ত। 'যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে' আর প্রকৃতি নিংড়ে জিনিষে পাহাড় গড়ে আত্ম ঘোষণায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিকদের রক্ত জল করে জন্ম দেওয়া জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্র শতক পেরনোর আগেই ওদের স্বোপার্জিত নিয়তির মত আজ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের হাতে চলে গেছে। এ কাজে প্রতিবাদী সংখ্যালঘুদের ধর্মভিত্তিক একমাত্রিক পরিচিতির রাজনীতিতে ঢুকে মসিহা খোঁজার রীতি আর উদার গণতান্ত্রিক ও বামেদের প্রশ্ন-হীন উপাস্য আধুনিকতা এবং তাদের ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মসিহা রূপও সহায় হয়েছে। মানুষ নয়, তবে মানুষেরই নামে জাতি-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আর উন্নতির জন্যে রণ-রক্ত-সফলতা অনেক দিনের প্রমাণিত উপপাদ্য। আধুনিকতা, জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্র আর পুঁজির স্বপ্নের সমসত্ত্ব দেশ-কাল-দুনিয়া আর আজন্ম ব্যবস্থা-সহায়ক, লাগাম-বাধ্য মানুষের আগমন যেন আসন্ন-প্রায়।

অথচ 'বাঁচিবার অবিরাম গাঢ় বেদনার ভার' তার ছায়ানুচর, ফলত জীবন জুড়ে প্রত্যহ সে বাজার ও ব্যবস্থা বিরোধী, নিত্যই স্ব-উদ্যোগে বেলাইন-বেলাগাম, কখনো একাকী কখনো যৌথ, যার আধুনিক নাম আত্মঘাত। ইতিহাসের সাক্ষ্য কেবলই জানান দিয়ে যায় সাধ্য-সঙ্গতি বাবদ যত দুঃস্থই সে হোক, 'নতুন করে এক পৃথিবী লেখা'র সাধ বাসনা তার যাবার নয়, এ হোমানলে সে নিরন্তন নিজ অস্থিমজ্জা সমিধ দিয়ে যায়, যেতে হয়। অনিঃশেষ এই সাধ-বাসনা জীবন, ওদিকে বাবুদের 'লৌকো বিলেস' পালার রাত্রি জোড়া আসর, সে একাকী আলপথে, লণ্ঠন, ইদানীং বেপুথমনা। যেন বা আলপথ, সাধ-বাসন, লণ্ঠন এসব আছে বলেই সে আছে – 'তাছাড়া দীঘির অন্ধকার'। এই শুধু

পথ দেখাচ্ছে শাহিন বাগ?

*'একবার তাকাবে না? নিজের মুখের দিকে চোখ ভরে?
মাঝে মাঝে ফিরে দেখা ভাল নয়?'*

আজ ভারতে হিন্দুত্বের ধর্মের ষাঁড় ধর্ম নিরপেক্ষদের সাজানো বাগান তছনছ করছে, প্রায় প্রতিরোধ-হীনভাবে। ধর্ম নিরপেক্ষ প্রগতিশীল মানুষজন বিমূঢ় মর্মাহত, একি হল হায়, বিশ্বের দরবারে জাত পাত মান বুঝি যায়। শহরে শহরে প্রতিবাদ CAA/NRC নিয়ে। বিখ্যাত ক্যাম্পাস সকল আজাদির স্লোগানে নিত্য কম্পিত। যেন বা আর এক স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক। হিন্দুত্বের ধর্মের ষাঁড় যেন আজ ভারতে মুসলিম-অস্তিত্বের পরিত্রানহীন সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে, অন্তত আন্দোলনে মুসলিমদের প্রায় একক অংশগ্রহণ, শাহিন বাগের অবিচল ধর্না বিক্ষোভ, শহরে শহরে সীমিত হলেও মুসলিমদের আবেগ উদ্দীপনা তেমনই সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু হিন্দুত্ব তো ওদের প্রায় শতাব্দী প্রাচীন ঘোষিত লক্ষ্যের বাইরে কিছু করছে না বরং তাতে ইচ্ছাকৃত ফাঁক থাকছে, ফাঁকি দিচ্ছে। যেমন CAA-তে ঘরের পাশে শ্রীলঙ্কা বাদ পড়লো কেন? ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কা থেকে কয়েক হাজার তামিল হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে তামিলনাড়ুতে আশ্রয় নিয়েছে, নাগরিকতা-হীনতার কারণে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করছেন আজ বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তারা এবং তাদের উত্তরপুরুষ কি এভাবেই বাঁচবে? তামিলরা তীব্র দ্রাবিড় স্বাভিমানের মুখ যাদের ঠিক উত্তর ভারতের হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের ছকে কোন কালেই বাঁধা যায়নি। তাই কি তাদের জন্য হিন্দু প্রেমে ঠাঁই নেই? আচ্ছা CAA-তে উল্লিখিত দেশগুলো থেকে হিন্দুরা ধর্মের কারণে নির্যাতিত হয়ে এদেশে আসলে তাদের এ সংক্রান্ত নথি দেখাতে হবে – থানায় FIR করে তার কপি নিয়ে আসতে হবে? এমন অসম্ভব দাবী কেন? এছাড়া ধর্মের কারণে ভবিষ্যতের নির্যাতিত হিন্দুদের ঠাই নেই কেন? তারা তবে কোথায় যাবে? হিন্দুত্ব কি করে হিন্দুদের জন্য এত অনুদার হতে পারলো? প্রতিবেশী দেশগুলিতে ধর্মের কারণে হিন্দু নির্যাতন কি উচ্ছেদ সত্যি সমস্যা হলে (যা প্রকৃতপক্ষে সত্য, বিশেষত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে) তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তথ্য সাবুদ হাতে নিয়ে কথা বলা হচ্ছেনা কেন? হিন্দুত্বের এই সব বড় বড় ফাঁক ফোঁকর পূরণের দাবি করা হচ্ছে না কেন? কেন বলছেন না গান্ধী হত্যার যড়যন্তে যুক্ত সাভারকরের হিন্দুত্ব যা আপনারা সফল করতে উঠে পরে লেগেছেন তা আদতে কিন্তু কেন্দ্রহীন-পরিধিহীন হিন্দু ধর্মকে, যাকে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের মত মানুষজন হিন্দু ধর্মের সাড় মনে করতেন, আপনাদের চির শত্রু ইসলাম কি খৃষ্টানীটির ছাঁচে, উপর থেকে এক কেন্দ্রীয় অতি নির্দিষ্ট পরিধি-বদ্ধ করে ঢেলে সাজাচ্ছেন? হিন্দুত্ব আসলে চিরকালীন হিন্দু ধর্মের শত্রু হয়ে উঠছে কেন?

না, এসব প্রশ্ন ধর্ম নিরপেক্ষ কি স্তালিনপরায়ন বামেদের পক্ষে চরিত্রগত কারণে করা সম্ভব নয়। হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত লাগবে এ যুক্তি ভোটের বাজারেও খাটে না কারণ আপাতত খেলার প্রতিভায় জিতে গেলেও হিন্দুত্ব কিন্তু ভোটের হিসাবে আজও সংখ্যালঘু। কিন্তু শাহিন বাগের দাদিরা কেন এসব প্রশ্ন তুলছেন না? কেন বলছেন না ধর্ম নয় রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থীর সজ্ঞা মেনে চলতে হবে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দিতে ? (যার মধ্যে কিন্তু ঐসব দেশগুলোর ইসলাম-দ্রোহী মুসলিমরাও পরবে বিশ্বাস/রাজনৈতিক মতামতের কারণে)। শাহিন বাগের দাদিরা এসব প্রশ্ন তুললে হিন্দুত্ব কিন্তু নিশ্চিত সমাধানহীন বিপদে পরবে। অবশ্যই কৌশল হিসাবে নয় প্রশ্নগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করেই সামনে আনতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ বিরোধীরা, সংবাদ মাধ্যম সহ, শাহিন বাগের দাদিদের হিন্দুত্ব বিরোধী মুখ হিসাবে শহর থেকে শহরে ঘোরাচ্ছেন প্রতিবাদ জোরালো করার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন করতেই হচ্ছে আদৌ কি শাহিন বাগ হিন্দুত্বের উপযুক্ত প্রতিবাদ, এমনকি ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিপ্রেক্ষিতে? দ্ব্যর্থহীন উত্তর না।

শাহিন বাগ সেই অতি প্রাচীন ধর্মভিত্তিক একমাত্রিক পরিচিতির রাজনীতি থেকে CAA বিরোধিতা এবং চরিত্রগত-ভাবে অভ্যাস জনিত প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া যা দেশভাগ উত্তর ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এবং তাদের মসিহার ভোটের তাগিদে অর্জন করেছে। এর মধ্যে দুঃখের হলেও সত্য, কিছুমাত্র গণতান্ত্রিক বোধ নেই, আছে নিছক মুসলিম সত্তার নিরাপত্তা খোঁজা। শাহিন বাগ এবং শাহিনবাগজাত অন্য শহরগুলিতে মহিলা ও দাদিরা আন্দোলনের মুখ বা মুখোশ যাই হন তাদের বোঝার দায় রয়েছে তাদের দাবির সংকীর্ণতা এবং চরিত্রগত ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাবার সম্ভাবনা যদি না উপরের প্রশ্নগুলো করেন এবং তসলিমা নাসরিনের মত মানুষজনদের এদেশে ঠাঁই দেবার দাবি করেন, যা রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আশঙ্কা হয় শহরের মুসলিম সম্প্রদায়ের পুরুষদের হিন্দুত্বের হাতে ধ্বংসের মনগড়া অতি আতঙ্কের (paranoia – অবশ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়) মূল্য চোকাতে এই সব মহিলাদের

ধর্নায় বসতে হয়েছে অথবা এই একই মানসিকতায় এরাও আজ সংক্রামিত। অন্যথায় আশার কথা অন্তত শহরের এই ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গ সাম্য বাড়বে, পারিবারিক হিংসা কমবে। তেমন যদি না হয় মানতেই হবে এসব ধর্না নির্মনন সম্প্রদায়-গত প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া, চরিত্রগত-ভাবে অনুদার ও অগণতান্ত্রিক। দেশভাগ উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশে যত দিন গেছে একমাত্রিক পরিচিতি-সত্তা আর হিংস্রতাই রাজনীতির একতম পথ ও পাথেয় হয়ে উঠেছে, অংশত দাবি এবং তার চেয়ে বেশি ভোট কুড়নো ছাড়া আর যা স্থায়ী হল ভেদবিভেদের ক্রম প্রসারতা। এর বীজ অবশ্য পোঁতা হয়েছিল আদিতে পশ্চিমি পাঠ মিলিয়ে সেই জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের কালেই যা দেশ-চিন্তক ও দেশোদ্ধারি বাবুদের আজও নজরের বাইরে রয়েগেছে। প্রকৃত পক্ষে অ্যাকাদেমিক, 'সোশ্যাল ওয়ার্ক' আর ভোটের বাজারে একবগগ পরিচিতি চর্চার মূল্য নগদেই পাওয়া যায়।

যা হোক, এই সব CAA বিরোধী সমাবেশের পাশে ধর্ম নিরপেক্ষতার রাজনৈতিক শুদ্ধতার দায় মেটাতে যে সব বর্ণ হিন্দুরা জমায়েত হয়েছেন তাদের কাছে প্রশ্ন CAA-এর এইসব ইচ্ছাকৃত ফাঁকফোকরগুলো এদের কাছে কেন তুলে ধরছেন না? অন্যথায় মসিহা হবার পিছুটানে আপনারাও কি প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়ায় ভুগছেন না যা আপনাদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তর? হাওড়ার যে মুসলিম মহিলা ভারতের অন্য প্রান্তের আর চার জন মুসলিম মহিলার সঙ্গে মিলে সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাকের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন হত দরিদ্র সেই ভদ্রমহিলার পাশে আজ দাঁড়ানোর কেউ নেই। দাবি ওঠার সাথে সাথে রুশদির বই নিষিদ্ধ হয়, দিনের বেলায় রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে তসলিমার বাঙলা বই নিয়ে তা-না-পড়া অবাঙালী মুসলিমরা প্রতিবাদ করলো আর মাঝরাতে বাম বাবুরা তাকে ঘাড় ধাক্কা দিল, শাহাবানু মামলার রায় উল্টে আইন(এসবই হিন্দুত্ব বিরোধীদের হাতে)। এসব নিয়ে রাস্তায় নেমে মিছিল ধর্নার কোন নজির নেই। হায়, তবে কি সংখ্যালঘুদের মসিহা রূপ ছাড়া এদেশে ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিকদের জন্য অন্য ভূমিকা তবে আর নেই!

চরিত্রগত-ভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সত্তা থেকে CAA বিরোধিতা হলে আদতে হিন্দুত্বে কাম্য বিরোধীতা, উপমহাদেশে হিন্দুত্বের বিপদকে আরও বড় পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে এবং হিন্দুত্বকে খুব বড় চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলা যাবে যদি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সত্তা থেকে নয় শুধু সংখ্যালঘু সত্তা থেকে হিন্দুত্বকে দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে আজ উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষজনকে শুধু হিন্দুত্ব নয়, সব ধরনের মৌলবাদকে ঠেকাতে হলে উপমহাদেশে উপনিবেশের টিকে থাকা ঐতিহ্যের বড় পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুত্ব ও অন্যান্য মৌলবাদকে দেখতেই হবে। হিন্দুত্ব কেন, কোন মৌলবাদেরই সুস্থায়ি উত্তর 'উদার গণতন্ত্রের' আলোয় নেই, খুঁজতে হবে যে অন্ধকারে তাদের জন্ম ও উত্থান সেই আঁধারে। তা না পারলে সকল বিরোধিতা আসলে শিক্ষাজাত অভ্যাস-জনিত প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া, যা শেষ পর্যন্ত বাঁজা হয়ে টিকে থাকে, স্বীকার্য যে তা এক পরম্পরার জন্ম দিতে সক্ষম। কাল খেলার প্রতিভায় জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরলেও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী, উদার গণতান্ত্রিকদের ও বামেদের হিন্দুত্বে বেঁধে দেওয়া এজেন্ডার মধ্যেই থাকতে হবে, অবশ্যই ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রথাসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় আচার সর্বস্বতা ফিরিয়ে আনতে পারে কিন্তু হিন্দুত্বের/মৌলবাদের হাতে আত্ম-বিলুপ্তির দেওয়াল লিখন তাদের স্বোপার্জিত।

দায় সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিমদেরও রয়েছে। হিন্দুত্বের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ যে চরিত্রগত-ভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার বা শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু সত্তার পক্ষে সম্ভব নয় বরং এই প্রশ্নে হিন্দুত্ব যে প্রয়োজনে নমনীয় হতে পারে তা বুঝতে হবে। হিন্দুত্ব মুসলিমদের জন্য যে চ্যালেঞ্জ এনেছে তা চরিত্রগত-ভাবে খুব বড় এবং গণতান্ত্রিক। হিন্দুত্ব,

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী, উদার গণতান্ত্রিকদের ও বামেদের জাতীয় কি আঞ্চলিক মসিহা রূপ অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে। মুসলিমদের কিন্তু আর প্রতিদ্বন্দ্বী মসিহাদের মধ্যে থেকে সঠিককে বেছে নিয়ে নিরাপত্তার বিনিময়ে ধর্ম ভিত্তিক একমাত্রিক পরিচিতির রাজনীতির গর্তে বাঁচা সম্ভব নয়। CAA বিরোধী আন্দোলনের সম্প্রদায়-গত অংশগ্রহণ বড় বেশি প্রকট এবং এর সাম্প্রদায়িক চরিত্র অর্জন করা অসম্ভব নাও হতে পারে যা হিন্দুত্বের কাছে চরম কাম্য। মুসলিমদের জন্য ধর্ম ভিওিক পরিচিতি সত্তার রাজনীতিকে অসম্ভব, অপ্রসঙ্গিক করে হিন্দুত্ব কিন্তু তাদের জন্য নিজের মুখোমুখি হবার, নিজের ইতিহাস পাঠের এবং স্বাবলম্বী হবার অপরিচিত সুযোগ ও দায় এনে দিয়েছে। এ যদি তারা এবং তাদের মসিহার বুঝতে অক্ষম হন তবে হিন্দুত্বের হাতে অবমানবের মত বাঁচা অথবা হিন্দুত্বের পরম কাম্য মুসলিম মৌলবাদের কৃষ্ণগহ্বর, এর বাইরে কি কোন তৃতীয় বিকল্প তাদের সামনে আছে? বলতেই হচ্ছে উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষ এবং সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিমদের আজ তৃতীয় বিকল্প খোঁজার সুযোগ ও দায় নিয়ে আসার জন্য, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করে নি, হিন্দুত্বের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

অবশ্যই ভারতীয় মুসলিমদের সম্প্রদায়-গত অবদমন, বৈষম্য, হিংসা যা তাঁরা নিয়ত ভোগ করছেন আজ নয়, সেই নেহেরু-আদি মসিহাদের কাল থেকেই, সম্প্রদায়-গত ভাবেই তাকে ভাষা দেওয়া, বিরোধিতা করার ন্যায্য অধিকার রয়েছে এবং অন্যদের তা শোনার, বোঝার, সহমর্মী হওয়ার দায় রয়েছে, দায় রয়েছে এই সম্প্রদায়-গত অবদমন, বৈষম্য, হিংসা বন্ধ করার কারণ তা শেষ পর্যন্ত সবাইকে হীন, বিকৃত করে রাখে। কিন্তু এখানে অতি দরকারি খেয়াল রাখার যা, তারা জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের আরোপিত ‘সমসত্ত্ব’ মুসলিম সম্প্রদায়-গত ধারনা থেকে এই বিরোধীতা করছেন কিনা। সে ক্ষেত্রে তারা জাতি-রাষ্ট্রে কাঙ্ক্ষিত অপরের ভূমিকায় নিজেদের নিয়জিত রাখছেন না কি? ভারতে হিন্দুদের মতো মুসলিমরাও বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতিতে বিভক্ত; নিছক ধর্মের একরঙা সুতোয় বাঁধা বিরোধিতা, প্রতিবাদ ফের ব্যবস্থাকেই জোরদার করবে। সম্প্রদায়-গত ঐক্যের, প্রতিবাদের মধ্যেও এই বহুত্বের স্বীকৃতি, উদযাপন একান্তই দরকার।

না, এ কোন লেলিনিয় মতে বাইরে থেকে উন্নত প্রজ্ঞার অধিকারী মুক্তিদাতা সচেতনতা আঁধারে থাকা নিম্নবর্গের জন্য বয়ে নিয়ে যাবার অছিলা নয়। প্রশ্নটা এই যে মুসলিম সম্প্রদায়ের বাইরে থাকা বিভিন্ন বর্গের মানুষ যারা জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের কোন না কোন ভাবে শিকার তারা কি নিছক ধর্মের সুতোয় বাঁধা এক রঙা কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঐক্য বোধ করতে পারবেন যদি তারা স্ব স্ব ভাষা, সংস্কৃত, আঞ্চলিকতাকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেন? পুঁজি আর জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের যেখানে প্রাণের মিল তা হল সমসত্ত্বতার দাবী, সমসত্ত্বতার নির্মাণ – বাজারের আর জাতির। এখন এদের হাতে শোষিত, নিপীড়িতদের শোষীত, নিপীড়িত সত্তা ছাড়াও ভাষা, সংস্কৃতি, পেশা, আত্ম ও কৌম পরিচিতি বাবদ নিজেদের আরও বহুবিধ সত্তা রয়েছে। সে সব সত্তাকে অস্বীকার করে যে রাজনীতি তা কি শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থার অনুমোদিত বিরোধিতা হয়ে ওঠে না?

পুঁজি আর জাতি-রাষ্ট্রের অনুমোদিত ছকের মধ্যে বিরোধিতায় মেতে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী, উদার গণতান্ত্রিক ও বামেরা নিজেদের অক্ষম, অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। আর দুর্নীতি কি পুঁজির প্রশ্নে তো কোন পার্থক্য নেই বলে হিন্দুত্বের/মৌলবাদকে মৌলিক বিরোধিতার জায়গাও তাদের জন্য কিছু নেই।

NRC-র রাজনীতি সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের, তা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে। CAA হিন্দুত্বের এজেন্ডা, NRC রাষ্ট্রীয় প্রকল্প।

'ফাৎনা মনস্কতা'

সাধারণ্যে উপনিবেশের আধুনিকতার অভিঘাত প্রথম লাগে বর্ণ হিন্দুদের, কিছু দোলচাল, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে পশ্চিমি সুধা পানও করে তারাই প্রথম। সিপাহী বিদ্রহোত্তর রানীর হাতে চলে যাওয়া ভারতে সাম্রাজ্যের সহায়তায় এক ধরনের বর্ণ হিন্দু আধিপত্য তৈরি হয় যা প্রতিদানে সাম্রাজ্যের আধুনিকতা বিস্তারে সহায়ও হল। অচিরে এই আধুনিকায়িত বর্ণ হিন্দু সাম্রাজ্যের কাছে জাতীয়তাবাদের পাঠ নিয়ে স্বদেশী সমাজকে পশ্চিমি জাতি-রাষ্ট্রের চশমায় দেখতে শিখল এবং পশ্চিমি আধুনিকায়নের পথেই সাম্রাজ্যকে পরাস্ত করার দীক্ষা নিল। হিন্দুর আমদানি এই আধুনিকতা, জাতীয়তাবাদী উদ্যোগ সবই স্বাভাবিকভাবেই ছিল তার চেতনায় রাঙানো – তার জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চিহ্ন, স্লোগান সবই হিন্দু সিন্দুক থেকে নেওয়া। আদিতে তার কাছে মুসলিম ঠিক অপর নাহলেও তার জাতীয়তাবাদ প্রশ্ন-চিহ্নিত। অচিরে কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো হিন্দু মানেই জাতীয়তাবাদী কিন্তু কখনো মুসলিমরা মূলধারার জাতীয়তাবাদে যোগ দিলে সে বা তারা জাতীয়তাবাদী মুসলিম কারণ মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবে জাতীয়তাবাদী নয়, যেমনটা কিনা হিন্দুরা।

জাতীয়তাবাদের নামে বর্ণ হিন্দুর আধিপত্যবাদকে মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের চোখে দেখত আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদও আর পাঁচটা জাতীয়তাবাদের মতই তত-কিছু উদার ছিলনা, যে কোন বৈচিত্র্যের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে সে স্বভাবতই ছিল চির দ্বিধান্বিত এবং নিজের অজান্তেই সমধর্মী পোষক। এভাবে চলতে চলতে জাতীয়তাবাদের আড়ে বহরে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ফাটল দেখা দিল তা ধর্ম ভিত্তিক হলেও সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু নামক আপাত ধর্ম নিরপেক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে, যতে গভীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক বহুত্বের ও তার তাৎপর্যের স্বীকৃতি ছিল – যা ক্রমে জাতীয় নেতাদের অবিমিষ্যকারীতায় ধর্ম ভিত্তিক একমাত্রিক দ্বি-জাতিতত্ত্বের রূপ পেলো। লিগের অতি বিখ্যাত এবং ভারত ভাগের ভিত্তি হিসাবে কুখ্যাত '৪০ লাহোর প্রস্তাবে ভারত ভাগের প্রস্তাব ছিল না, পাকিস্তান শব্দটাও ছিল না। এছিল সংখ্যালঘুর স্বার্থ, নিরাপত্তা, অধিকারের প্রশ্নে ভারতের মধ্যেই অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব। অসীম ক্ষমতাশালী কেন্দ্রের ভাবনা (না হলে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে – আজকের হিন্দুত্বের রাজনীতির সঙ্গে বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক মিল) থেকে হিন্দু প্রেস লাহোর প্রস্তাবকে নাম দিল পাকিস্তান প্রস্তাব। অদ্ভুত ভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় নেতারাও এই নামকরণের বিরোধিতা করলেন না। আজ এটা প্রমাণিত জিন্নাহর পাকিস্তান আসলে ছিল দর কষাকষির ভিত্তি, জিন্নাহ ছিলেন সেন্টালিস্ট, ভাল ভাবেই জানতেন ভারত ভাগ ভারতীয় মুসলিমদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অংশীদারি চ্যুত করবে; এ বলা ভাল এক রকম হুমকি। আদত দাবি ছিল কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ ও স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা চাই। যতই দিন যেতে লাগলো ধর্ম, শুধুই ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠন কি ভাগাভাগিতে দলমত নির্বিশেষে নেতারা ব্যস্ত হলেন। শেষে একদা অসম্ভবকে সম্ভব করে একমাত্রিক ধর্ম ভিত্তিক দ্বি-জাতিত্বের নামে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ভাগ হল।

একা গান্ধী বাদে সব মত-পথের রাজনৈতিক নেতারাই ছিলেন পশ্চিম প্রেরিত – তাদের রাজনৈতিক বোধ, উন্নয়ন ভাবনা, ঐতিহ্যের আশ্রয়, স্বদেশ পাঠ সবের জন্য ছিল অভ্রান্ত দৃষ্টি দাতা ইউরোপিয় আধুনিকতার চশমায়; শিক্ষা-দীক্ষা, বোধ-ভাষিতে ঐ পশ্চিম প্রেরিত হবার কারণেই ঐক্যমূলক দ্বন্দ্ব ভোগা শিবিরে বিভক্ত নেতারা বুঝলেন না

দেশভাগ মানে উপমহাদেশে বিচ্ছিন্নতা-সাম্প্রদায়িকতা চিরকালীন করে রাখা শুধু নয়, সম্প্রদায়গত অপরিচয় আর সন্দেহ উপমহাদেশের মানুষকে কত হীন, চিরদুঃস্থ করে রাখবে। স্বভাবতই চরম নির্মমতা আর ক্ষমতা-অন্ধ, ফাৎনা মনস্কতার পরিচয় দিয়ে দেশ ভাগাভাগিতে মাততে দ্বিধা বোধ করলেন না। আমাদের ব্রাক্ষণ্যতন্ত্রের ধর্মীয় থাকবন্দী ব্যবস্থার অস্পৃশ্যতা তাটুকু বাদ দিলে তার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতার একমাত্রিক উপযোগবাদিতার হিংস্রতা, অসাড়তা চরিএগতভাবে সমধর্মী। ফলে সাধারণভাবে বর্ণ হিন্দু যে দ্রুততায় এবং স্বভাবসিদ্ধিতে পশ্চিমি আধুনিকতা আত্মস্থ করল তা অন্যরা করতে পারেনি। তাঁর জন্মগত, আত্ম-প্রশ্নহীন সুবিধা তাঁকে দ্রুত ক্ষমতার জন্যে ফাঁৎনা মনোস্ক করে তুলল এবং সে সিদ্ধিতে সে সচ্ছলও হল তার ঐ ব্রাক্ষণ্যতন্ত্রের কল্যাণে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের মধ্যে অপর পরিপোষকতার, বিরুদ্ধ মত-পথ ও ধর্মের গ্রহণযোগ্যতার, সহাবস্থানের, অপর সাপেক্ষে আত্মতা নির্মাণের যে চরিএগত স্বাভাবিক সামর্থ্য ছিল, আধুনিকতা তাকে ধর্মনিরপেক্ষ করে সেই বহু যুগের চরিএগত স্বাভাবিক সামর্থ্য-শূণ্য করে দিল। ঐ উপনিবেশ পর্বেই সে শিখল অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতাই জীবনের ধ্রুবপদ আর তার জন্য চাই ভাগিদারহীন-দাবিদারহীন ক্ষমতা – জন্ম নিল ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ আর ব্যক্তির ভোগব্যয় কেন্দ্রীক উন্নয়ন ভাবনা যা আজকের হিন্দুত্বের জ্যেষ্ঠ সহোদর ও পোষকও বটে। উল্টো দিকে দেরিতে জাতীয়তাবাদের খড়ির গন্ডিতে পৌঁছে মুসলিমরা দেখল সর্ব স্থরে তার তাৎক্ষনিক এবং অব্যবহিত প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ণ হিন্দু (যা পরে ভাষা আর সাংস্কৃতিক বৈচিএ হারা আপামর হিন্দু হিসাবে দেখা হবে)।ঐ খড়ির গন্ডিতে তার প্রযোজনিয় অপর ও ইতিহাস হল যথাক্রমে হিন্দু ও ইংরেজদের হাতে খোয়ান ইসলামিক ভারত। তার জাতীয়তাবাদ নির্মাণে ক্রমে হতভাগ্য হিন্দুর মতই ভাষা আর সাংস্কৃতিক বৈচিএ হারা এক আজব একমেটে ইসলাম, বলা ভাল বর্ণ হিন্দুর জাতীয়তাবাদের মতই শহুরে সম্পন্ন মুসলিমদের সাধারণ্যে অবোধ্য ইসলামিক জিগির। বর্ণ হিন্দুর জাতীয়তাবাদে প্রথম অপর ইংরেজ (এ ক্ষেএে কাঙ্ক্ষিত/আদর্শ অপর) পরে মুসলিম, মুসলিমদের অপর নির্মাণ টিক উল্টো – আগে (বর্ণ) হিন্দু পরে ইংরেজ। এই অপর নির্মাণের মধ্যে দিয়েই বাবুরা বোঝাপড়ার পথ প্রথম থেকেই সংকীর্ণ করে রাখলেন। এই খড়ির গন্ডিতে অবশ্য দলিত আর আদিবাসীর প্রবেশাধিকার ছিলনা। ফলে স্বাধীনতা নামক ক্ষমতা হস্তান্তর লগ্নে বাবুদের ভেন্ন হাঁড়ি হতে দ্বিধা হলনা। সাধারণ ভাবে জাতীয়তাবাদে চরএগত বড় ঘাটতি হল তার খড়ির গন্ডিতে সাধারণ্যের প্রবেশ নিষেধ – যা ঠিক করার উপর থেকের বাবুরাই করেন। যে উত্তরাধিকার পরে বামেতেও বর্তায়। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের জীবন এই খড়ির গন্ডি মোছার ব্রত, যে ব্রতের পরম উদযাপনে মানুষ পৌঁছাবে তার চির কাঙ্ক্ষিত সাকিনে – আনীল আকাশের নিচে বহুবর্ণ হাটখোলায়। এ ব্রত আমরা জলে ভাসাইনি। তার মূল্য আজ হিন্দুত্বের হাতে চোকাতে আমরা বাধ্য।

প্রথমে দুটি জাতি-রাষ্ট্র, পরে জাতি গঠনে ধর্মের ভূমিকা কত বাতুল প্রমাণ করে ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক বাঙালী জাতি সত্তার বিকাশের দাবিতে স্বাধীন বাংলাদেশের উদয়। আজ তিন টুকরো হয়ে যাওয়া ভারতীয় উপমহাদেশে জাতি-রাষ্ট্রের হাত ধরে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি '৪৭ থেকে কল্পনাতীত খারাপ। সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় উপমহাদেশের যেন নাছোড় নিয়তি, অথচ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারতো এবং যা আজও সম্ভব। ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু নেতারা বুঝলেন না দেশভাগ মানে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে চিরকালীন করে রাখা, জিন্নাহ বুঝলেন না পাকিস্তান মানে উপমহাদেশে মুসলিমদের চির বিচ্ছিন্নতা, চির প্রশ্ন চিহ্নিত হয়ে থাকা। গান্ধী বাদে দুপক্ষের কেউ কি সেদিন বুঝেছিলেন দেশ ভাগাভাগি উপমহাদেশর কোন শিকড়ে আঘাত করছে – মানুষকে শেষ পর্যন্ত অপর-নিরপেক্ষ হয়ে একরঙা ধর্ম-সুএে আত্মতা নির্মাণ করতে হবে – পরিণতিতে একমাত্রিক আত্মপরিচয়ের দুঃস্থতা নিয়তি হবে? ধর্ম

নিরপেক্ষরা যদি প্রথম থেকে লিগকে মুসলিমদের একমাত্র নয় ঠিকই কিন্তু আর এক বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিত তবে বোঝাপড়া অনেক সহজ হতো। লিগের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে না পারার ভুল এবং তা দেশভাগ দিয়ে মেটাতে হল সে কথা গান্ধীও স্বীকার করে গেছেন। আর কি কখনো আমরা অপর-সাপেক্ষে আত্মতা তৈরি করে নিতে শিখব? এটাই উপমহাদেশের সবচে বড় মানবিক সঙ্কট, সবচে বড় মানবিক প্রশ্ন।

আজ পর্যন্ত জাতি-রাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচে বড় পরিহাস ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া দুটি রাষ্ট্রই নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ ঘোষণা করলোও, যা আদতে সম্ভব ছিল না আর হয়ও নি। এই দাবির মধ্যেই প্রমাণিত হয় দুই সম্প্রদায়ের নেতারা যা চেয়েছিলেন তা আসলে নিজেদের আধিপত্য কায়েমের হোম-ল্যান্ড – যা তারা সাম্রাজ্যের সহায়তায় পেলেনও। ভারতীয় উপমহাদেশে মহারাষ্ট্র ছাড়া পাঞ্জাব আর বাংলাই সবচে সোচ্চার ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে, সেই সশস্ত্র স্বদেশী পর্ব থেকে সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদ পর্যন্ত। এই দুই রাজ্যের হিন্দু নেতারা কেন ভাবতে পারলেন 'Partition is far better than parity'?

দুপক্ষই প্রস্তুত ছিল ফলে দাঁড়ালো 'ঘণ্টা বাজার আগেই শহর এক লহমায় নিলাম'।

অন্ত্যমিলের ছন্দে বাঁধা

হিন্দুত্বের আদি পিতা সাভারকরের জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ প্রগতিশীলদের কোথায় মৌলিক বিরোধ? নাকি জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের প্রশ্নে আদতে তেমন মৌলিক বিরোধ সম্ভবই নয়? এ প্রসঙ্গে একটি দরকারি তথ্য এই যে সাভারকরের সাথে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে মতের মিল ছিল শুধু জিন্নাহর নয়, সুভাষ বোস এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়েরও যিনি আবার তৃতীয় আন্তর্জাতিকে লেনিনের সঙ্গে যথার্থভাবে বিতর্ক করে উপনিবেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে শ্রেণী সংগ্রামের বিকল্প রূপের কথা বলেন। সাভারকরটোপিয়ায় (আশীষ নন্দীর ভাষায়) জাতি-রাষ্ট্রে বহুর জায়গা নেই, সমসত্ত্ব জাতি গঠনের প্রয়োজনে সহিংস হতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই, চাই উপনিবেশের ধাঁচে শক্তিশালী অবশ্য মান্য কেন্দ্র, জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনে দরকারে দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে দেশভাগ আর পাথেয় বলতে প্রশ্ন-হীন পশ্চিমি জাতি-রাষ্ট্রের আধুনিকতা। ধর্ম নিরপেক্ষরা কোথায় এদের থেকে আলাদা? সেই তো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে নারাজ হয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনে অনড় থেকে দেশ ভাগাভাগিতে বরং সহজে সম্মত হলেন, ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনে প্রবল অনিচ্ছা, শেষে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়ে ভারত জুড়ে হিন্দি চাপানোর অক্লান্ত চেষ্টা, শক্তিশালী, অবশ্য-মান্য কেন্দ্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থা, জাতি-রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রশ্নে আদ্যন্ত হিংসাশ্রয়ী হতে দ্বিধাহীন, কাশ্মীর, উত্তরপূর্ব ভারত তার আজও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর উন্নয়ন বলতে পশ্চিমের আদলে ব্যক্তির ভোগব্যয় বৃদ্ধি সর্বস্বতা, সমিধ বলতে দলিত, আদিবাসী, গরিব আর প্রকৃতি। ভারতের যেখানে প্রাণ সেই সীমাহীন বৈচিত্র্যের প্রশ্নে উভয়েই সমান অসাড়। তার চাই স্বর্ণালী অতীত যাতে ভাগ বসানোর কেউ থাকবে না আর রাজনীতির দানাপানি হিসাবে চাই অপর। এই অপরও তার ইতিহাসের মতই মনগড়া – একরঙা, সমসত্ত্ব। দুনিয়াজোড়া জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের ইতিহাস কিছুমাত্র অন্য সাক্ষ্য দেয় না। উপমহাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায় যত দিন গেছে রাজনীতির দাবি মেটাতে 'ইতিহাস' আরও স্বর্ণালী হয়েছে, অপর আরও সমসত্ত্ব হয়েছে, আজ হনন যোগ্যও হয়ে উঠেছে। বিরোধীদের মধ্যে গভীর সুদূর প্রসারী মিল ছিল আরও এক জায়গায়।

পশ্চিমি জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের একরোখা বিরোধী ছিলেন গান্ধী। অনন্যোপায় হয়ে দেশভাগ মেনে নেওয়া গান্ধী কিন্তু মুসলিমদের অধিকার এমনকি পাকিস্তানের প্রাপ্য নিয়েও সোচ্চার। প্রকৃতপক্ষে ওঁর অনশনের হুমকির মুখেই সদ্য স্বাধীন দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় নেতারা দিল্লির দাঙ্গায় ঘরহারা মুসলমানদের ঘরে ফেরাতে, নিরাপত্তা দিতে, মসজিদ উদ্ধারে বাধ্য হন। এমনকি বাধ্য হন দেশভাগ জনিত কারণে পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫০ কোটি টাকা মিটিয়ে দিতে, তখনো অস্পষ্ট অবস্থানে থাকা কাশ্মীরে হানাদারির অজুহাতে যা তারা দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

'মেয়েলিপনায় ভোগা' একটা লোক যে পশ্চিমের পলিটিকাল সায়েন্স বোঝে না, বোঝার প্রয়োজনও বোধ করেন না, জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজন বোঝে না, রাজনীতিতে সত্য, অহিংসা আর সোল ফোর্সের মতো কথা বলে, মুসলিম 'তোষণ' করে কারণ জাতীয়তাবাদের জন্য ঘৃণা কি অপরের প্রয়োজন অস্বীকার করেন! হিন্দু জাতি-রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিত প্রাণেরা জাতির স্বার্থে এমন 'মেয়েলিপনায় ভোগা' এক পুরুষের এত অনাচার কিভাবেই বা সহ্য করেন? ওঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হলে জাতি-রাষ্ট্র প্রথম থেকেই দুর্বল, 'মেয়েলি' হয়ে যাবে না? প্রকৃতপক্ষে এইগুলোই ছিল আদালতে গডসের গান্ধী হত্যার স্বপক্ষে যুক্তি। শুধু হিন্দুত্ব নয় জাতি-রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখলেও যথার্থ যুক্তি, যা পরে ধর্ম নিরপেক্ষরাও প্রমাণ করেন তাদের একচেটিয়া ভাবে নির্মিত সহিংস জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে। সাভারকরের মত একই পশ্চিমি জাতি-রাষ্ট্র আর আধুনিকতায় নিবেদিত প্রাণ নেতাদের কাছে কোন উত্তর ছিল না যখন উনি নেতাদের মতিগতি দেখে বিরক্তির সঙ্গে তিরস্কার করেন 'English rule without English men'। তাদের তরফে প্রকাশ্যে সঙ্গতি না থাকলেও উপেক্ষার প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠেছিল।

শুধু ঘৃণায় নয়, RSS যে গান্ধীকে খুন করলো তা একপ্রকার নিরুপায় হয়ে। অহিংসা, পরমত-পরধর্ম সহিষ্ণু, লিঙ্গ-ধর্ম-জাত-ভাষা নিরপেক্ষভাবে সমানাধিকারে বিশ্বাসী গান্ধীর সবাইকে নিয়ে চলার জাতীয়তাবাদ ছিল ওদের চোখের বালি। বাউলের রঙিন আলখাল্লার মত ঢিলেঢালা আর বাউলের মতই সহজিয়া ভারত শুধু হিন্দুত্বের নয় ধর্ম নিরপেক্ষদের কাছে আজও দুঃস্বপ্ন, কারণ তাকে ঐ আদর্শ পশ্চিমি জাতি-রাষ্ট্রের খাপে ধরানো যায় না। এ বাবদ বহুবর্ণ ভারতে পশ্চিমি ধাঁচের জাতি গঠনের অসম্ভবতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সতর্কতা স্মরণীয় – Nation building in India is like navy building in Switzerland। গান্ধীর রাজনীতির উৎসেও ছিল এ উপলব্ধি জাত ভারতীয় বৈচিত্রের অখণ্ডতা রক্ষার তাগিদ কারণ তবেই ভারতীয় সভ্যতা টিকবে এবং পথ দেখাতেও পারে পশ্চিমকে তাঁর সৃষ্ট উপনিবেশ আর আধুনিকতার দাসত্ব মুক্ত হয়ে বাঁচার।

কিন্তু সাম্রাজ্য পোষিত সভ্যতাকে বর্ণ হিন্দু জাতীয় নেতারা এতদূর আত্তীকরণ করেছিল যে আদ্যন্ত উপলব্ধিতে অক্ষম তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন পশ্চিমের সাপেক্ষে আদতে হয়ে উঠছিল উপনিবেশের প্রতিস্পর্ধী বর্ণ হিন্দুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দাবি। থাকবন্দী ভারতীয় সমাজে পশ্চিমের পাঠ মিলিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে যা দাঁড়ালো তা মূলত মধ্যবিত্তের ক্ষমতার দাবিতে এবং যেখানে সম্ভব ক্ষমতায় অংশগ্রহণের একধরনের মুনশিয়ানা যা নিম্ন বর্ণ/বর্গের মানুষজনের রাজনীতিতে যোগদান অপ্রয়োজনীয় এমনকি অসম্ভবও করে তুলেছিল, কখনো তাদের বিরুদ্ধেও যাচ্ছিল। এই রাজনীতি ভারতীয় সমাজের জাতপাতের সমস্যা তো বুঝলই না বরং নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিল এবং নিরন্তর বাড়িয়ে তুললও। ভারতের জাতীয়তাবাদ রূপি বর্ণ হিন্দুর আধিপত্য নিছক জাতি-রাষ্ট্রের চাহিদা মধ্য ও উচ্চ বিত্তের মধ্যে তীব্র করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। একে দুদিক থেকে যে দুজন রাজনীতিক চ্যালেঞ্জ করেছিল তাদের কথা শোনা, বোঝার অমার্জনীয় অনীহা এবং অক্ষমতা ধর্ম নিরপেক্ষতা

দেখাতে পেরেছিলেন স্রেফ এই অহং-এ যে তারাই দেশের একমাত্র প্রতিনিধি। এ বাবদ গান্ধীর অক্ষমতাও স্মরণীয়।

তবে স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজার মুহূর্তেই যে তিনি নেতাদের কাছে প্রয়োজনীয়তা কি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন তা মনে হয় গান্ধী নিজেও বুঝতে পারছিলেন, নির্মলকুমার বোসের সাথে পাটনায় কথাবার্তা সে রকমই সাক্ষ্য দেয়। জাতি-রাষ্ট্রের বিরোধী ছিলেন বলে দেশভাগের বিরোধিতা করেছিলেন, শেষে অনন্যোপায় হয়ে মানেও নিয়েছিলেন, যদিও উৎসব লগ্নে যখন ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় নেতারা মধ্য যামিনীতে নিয়তি অভিসারে যাত্রা শুরু করলেন, তিনি স্বেচ্ছায় কেন্দ্র থেকে সুদূরে থাকলেন, পৃথিবীর তাবৎ মিডিয়াকে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করে বললেন 'I run dry', কথাটা জাতীয় নেতাদের কাছে কতদূর সত্য ছিল তা অচিরেই বোঝা গেল। শুধু জাতীয় নেতাদের কাছে নয় সম্পন্ন শহুরে বর্ণ হিন্দু বাবুদের কাছেও গান্ধীর ইহলোক ত্যাগ জরুরী হয়ে উঠেছিল (গান্ধী হত্যার পর যড়যন্তে জড়িত ৯ অভিযুক্তের আইনি সহায়তা দেবার জন্য ৩-৪ লাখ টাকা চাঁদা উঠেছিল! এটা কি আজকের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মধ্যবিত্তের পূর্বপুরুষদের চিন্তা-চরিত্রের উজ্জ্বল সাক্ষর নয়?)।

সাভারকরের অনুপ্রেরণায় কোন এক গডসে-আপ্টে পুনে থেকে এসে রীতিমত রেকি করে গান্ধীকে খুন করে যায় – যেতে পারে। তার আগে ২০ জানুয়ারি মদনলাল পাওয়ারের ব্যর্থ চেষ্টা, ধরা পরা, ষড়যন্ত্রের স্বীকারোক্তি, যাবতীয় গোয়েন্দা সতর্কতা কোন কিছুই জাতীয় নেতাদের গান্ধীর নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীনতা ঘোচাতে পারলো না কেন? ঘোষিত ভাবে তাঁর স্থান তো তর্কাতীতে (একটি অবিস্মরণীয় জনশ্রুতি: গান্ধীর শেষকৃত্য কিভাবে সম্পন্ন হবে তা নিয়ে নেতারা আলোচনায় বসেছেন, কয়েক লক্ষ লোকের সমাবেশ হবে, বিদেশ থেকে লোক আসবে, কিভাবে এসব সামলান হবে? দিল্লি পুলিশের পক্ষে যে সম্ভব নয় তা বোঝা যাচ্ছে, তবে কি মিলিটারি ডাকতে হবে ? আলোচনা চলছে নেতারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না, আচমকা নেহেরুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া 'Let's talk to Bapu'। সভা ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ, শরীরগুলো প্রথমবারের জন্য উপলব্ধিতে আনতে সক্ষম হল তিনি নেই। জনশ্রুতি অনুযায়ী নির্জ্ঞান জুড়ে এতদূর যদি বাপু তবে দেশভাগের প্রশ্নে আনখশির বাপু বিরোধিতা কেন?), গান্ধীর চির 'ইয়েস ম্যান' প্যাটেল তো তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, তারই তো গান্ধীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা। কি করে থাকলেন এত দূর উদাসীন? ঠিকই যে ২০ তারিখের ব্যর্থ চেষ্টার পর গান্ধী নিরাপত্তা নিতে অস্বীকার করেছিলেন যা ওর দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন গান্ধী হত্যার দুদিনের মধ্যে সাভারকর সহ যে নজনকে ধরা হল মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের তো ২০ তারিখের পরেই মদনলাল পাওয়ার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা যেত। হল না কেন? খেয়াল রাখা যাক আশীষ নন্দীর ব্যাখ্যা 'Every political assassination is a joint communique' (মৃত্যুর দ্বারে মদনলাল পাওয়ার স্বীকারোক্তি 'আমরা সে সময় মানুষ ছিলাম না'।

সদ্য স্বাধীন দেশে জাতি-রাষ্ট্র গঠনে কি আধুনিকায়নে গান্ধী এক পাহাড় প্রমাণ পথের কাঁটা। ওকে স্বীকার কি অস্বীকার করার মত মেধা, শ্রম, সাহস কি সৃজনশীলতা ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় নেতাদের ছিল না। মুখস্থ-বিদ ছাত্রের কাছে তেমনটা দাবি করাও অবশ্য অসঙ্গত। ওঁর যে কোন প্রকার অপসারণ সব শিবিরের কাছেই হয়ে উঠেছিল পথের দাবী।

সাভারকরের ধর্ম নিরপেক্ষ সমালোচকেরা কখনই বলেন না কেন গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কারণে সাভারকরকে জেলে যেতে হয়েছিল যদিও ট্রায়াল কোর্টে ছাড়া পান প্রমানাভাবে এবং প্রমাণ থাকা স্বত্বেও সরকারী

ক্ষমতায় থাকা ধর্ম নিরপেক্ষরা উচ্চ আদালতে গেলেন না অথবা প্রমাণ থাকা স্বত্বেও তা ট্রায়াল কোর্টে পেশ করা হলনা। এ কি সমাপাতন না সমধর্মীর মিল যে হিন্দুত্ব জেনে বুঝে টিগার টানল আর ধর্ম নিরপেক্ষ নির্জ্ঞানে সহায়তা দিল? (১৯৬৬ সালে বিচারপতি কাপুরের নেতৃত্বে গান্ধী হত্যার তদন্ত কমিশন সাভারকর সহ বাকিদের জড়িত থাকার প্রমাণ রেখে গেছে। হিন্দুত্বের বিরোধীরা এসব নিয়ে আজ গান্ধী বন্দনা করতে গিয়েও চুপ কেন? ১৯৬৯ সালের এই রিপোর্ট না প্রকাশ করা হল না তার ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ করা হল। আর কতভাবেই বা ধর্ম নিরপেক্ষরা হিন্দুত্বকে সহায়তা দিতে পারেন? হিন্দুত্বর কি কোন কৃতজ্ঞতা থাকতে নেই!) ধন্যবাদ জানাতেই হয় আজও ধর্ম নিরপেক্ষরা নির্জ্ঞানে পিতৃ হত্যার অপরাধ-বোধ বয়ে বেড়াচ্ছেন বলে আর এক অপরাধীর দিকে আঙুল তুলতে পারছেন না। আজ যে প্যাটেলের পৃথিবীর সর্বোচ্চ মূর্তি তা কি হত্যাকারীর পক্ষে সহায়ককে অঘোষিত কৃতজ্ঞ স্মরণ?

হিন্দুত্বের দান

দেশভাগ আর গান্ধী হত্যার তাৎপর্য সময়ে না বোঝার দায় আজও উপমহাদেশ মিটিয়ে চলেছে, তার সাম্প্রদায়িকতা আর পশ্চিম যাত্রা এখানে স্থায়ী হল। ধর্ম নিরপেক্ষরা জাতি-রাষ্ট্র, আধুনিকায়নের খেলায় মেতে দেশভাগ, গান্ধী হত্যাকে দ্রুত হিমঘরে পাঠাবে তা একরকম স্বাভাবিক। কিন্তু বামেরা এসবের তাৎপর্য বুঝলেন না কেন? ওদের তখনকার ভ্যাটিকান মস্কো থেকে তেমন কোন দলিল ওদের হাতে মুখস্থ করার জন্য তুলে দেওয়া হয়নি, সে ক্ষেত্রে নাবালকের ঘাড়ে এত বড় বোঝা চাপানো শ্রম আইন লঙ্ঘন হয়ে যাবে না! অবশ্যই স্মরণীয় যে ওরা তখন আরও ভারি দায় স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছিল – বিপ্লবের ডাক দিয়ে রাস্তার আলো লাল সেলোফেনে মুড়ে মুক্তাঞ্চল গঠনে নিবেদিত প্রাণ, ঝুটা আজাদিকে সাচ্চা করতে হবে না? হায়, মানুষ সাড়া দিলে আজ প্রতিরোধ-হীন গৈরিক উত্থান দেখতে হতো না! প্রসঙ্গত গত শতকে ভাগাভাগি হয়ে ওদের একদল ধর্ম নিরপেক্ষদের হাত ধরে দেশ থেকে উবে গেল আর একদল ৩৪ বছর রাজ্যপাট চালিয়ে শেষে ধর্ম নিরপেক্ষদের হাত না ধরলে আজ চিহ্নহীন হয়ে যাবার মুখে। ইতিহাস না ঈশ্বর কার এমন নিষ্ঠুর লীলা নাবালকদের সঙ্গে? এরা ভুলে গেলেন দুর্নীতি, দাঙ্গা, পুঁজির পোষণ প্রভৃতি যে সব অভিযোগ হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে করছেন সে সব কিছুতেই সাধের সঙ্গী ধর্ম নিরপেক্ষরা হিন্দুত্বের থেকে অনেক এগিয়ে, প্রকৃতপক্ষে এসবেরই পথিকৃৎ তারাই। আগ্রাসী ভূমিকাটুকু বাদ দিলে হিন্দুত্ব নতুন কি করছে যা ধর্ম নিরপেক্ষরা করেনি, হ্যাঁ এমনকি ঠাণ্ডা মাথায় দাঙ্গাতেও হিন্দুত্ব ওদের অনুসরণ ছাড়া নতুন বলতে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্ভব করেছে। লিঙ্গ সাম্যের এমন মৌলিকতার জন্যে, ছোট ক্ষেত্রে হলেও, হিন্দুত্বের এহেন সৃষ্টিশীলতা স্বীকার করতেই হয়। প্রসঙ্গত স্বীকার করে নেওয়া যাক বঙ্গীয় বামেদের আরও বড় এক রাজনৈতিক সৃজনশীলতা – হিংস্র রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা যা চরিএগত ভাবে সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ এবং এ বঙ্গে শাসক নিরপেক্ষ ভাবে স্থায়ী হয়ে গেছে যা প্রতিরোধের কোন দিশা আজও অনায়ত্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গ বামেদের কল্যাণে বর্ণ হিন্দুর থাক বন্দী কৌলীন্য অটুট থাকল বলে এহেন সৃষ্টিশীল সাম্প্রদায়িকতা কারুর নজরে পড়লো না। ধর্মীয় জতীয়তাবাদিদের কাছে আজ বঙ্গ জনের মূল্য চোকাতে হবে বামেদের সৃষ্ট এবং শিবির পরম্পরায় বহমান রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে অন্ধ থাকার প্রজন্ম ব্যাপী ঐতিহ্যের কারণে।

হিন্দুত্ব ভারতের 'সিঁড়ি সমাজ'-এ পরিচিতি ভিত্তিক অসাম্যের যে সামাজিকতা তাকে ধর্ম ভিত্তিক পরিচিতির সাম্যে ঢাকতে আজ অনেক দূর পর্যন্ত সফল হয়েছে। কেন সফল হল অথবা বিরোধীরা পরিচিতি ভিত্তিক অসাম্যের

সামাজিকতা কেন ঘোচাতে পারলো না? ভারতীয় সমাজে এই সামাজিক অসাম্য আর অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে গভীর যোগ আছে। '৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত বৈষম্য বেড়েই চলেছে অথচ নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক উত্থানও ঘটেছে এই সময়েই। সাধারণভাবে বলা যায় নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ক্ষমতা-দুর্নীতির চক্রে আত্মসাৎ করে এই বৈষম্যকে স্থায়ী আর প্রসারিত করা গেছে। এবং এটা ঘটেছে কিন্তু হিন্দুত্বের বিরোধীদের তত্বাবধানে। হিন্দুত্বের কাছে এই কৃতকর্মের মূল্য চোকাতে সে আজ বাধ্য এবং অসহায়ও বটে।

ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ থেকে শুরু করে বিপ্লবী বাম কোন কিসিমের রাজনীতি ভারতীয় সমাজের নিজস্বতা – আধুনিক কালের সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত আর উপনিবেশের আধুনিকতার সীমাবদ্ধতা বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এসব প্রশ্নে বরং রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী অনেক বেশি সংবেদনশীল ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। সামগ্রিকভাবে '৪৭ উত্তর ভারতীয় রাজনীতি এদের পাঠ্য জ্ঞান করেনি, বরং সাধারণ্যে এদের পূজ্য এবং অপঠিত করে রেখেছে। পুঁজির অনিবার্য নৈরাজ্য আর নিরন্তন বেড়ে চলা বৈষম্যকে ঢাকতে জাতীয়তাবাদ পরীক্ষিত হাতিয়ার। '৪৭ পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃষি উৎপাদনের বৈচিত্র্য পুঁজির তাড়নায় যত সমসত্ব হয়েছে, ধর্ম কি জাতীয়তাবাদ তত বিশ্বাস, আদর্শের থেকে পুরপুরি লাভ ক্ষতির হিসেব কষে ঠাণ্ডা মাথায় অপর দলনে সিদ্ধ হয়ে উঠেছে। '৫০ থেকে উপমহাদেশের ছোট বড় দাঙ্গা, পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার এর সাক্ষ্য দেয়। যত দিন গেছে উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রেকে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে রাজনীতি, সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা, প্রশাসনিকতা শক্ত পোক্ত হয়েছে।

হিন্দুত্ব কি ধর্ম নিরপেক্ষদের (বাম সহ) জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য কি? হিন্দুত্বের সঙ্গে বাকিদের পার্থক্য বলতে এই যে বাকিরা, নেহেরু যাদের মধ্যে জাতীয়-আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সবচেয়ে সফল উদাহরণ, মুসলিমকে অপর জ্ঞনেই, তবে দলন নয়, তার রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছে। নিরাপত্তার শর্তে মুসলিমরাও ঢুকে গেলেন ধর্ম ভিত্তিক একমাত্রিক পরিচিতির রাজনীতির গর্তে। আজ হিন্দুত্ব মুসলিমদের সেই পরিচিতির রাজনীতিকে অসম্ভব করে তুলে তাকে হনন যোগ্য, দলন যোগ্য করে তুলেছে। তো এখন রক্ষায় কি দলনে মুসলিমদের কি ফারাক পরছে? সে তো সেই জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অপরই থেকে যাচ্ছে। জাতি-রাষ্ট্রে কি এই সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব ? হিন্দুত্ব ঠেকাতে যে নিশ্চয়তার সঙ্গে আশীষ নন্দীর মত মানুষজন ভাবতে পারেন 'Hinduism will resist Hindutva' অথবা 'Caste will take care of Hindutva and let cricketers take care of Nationalism' - পরিস্থিতি কি ঠিক এতটাই সরল? হিন্দুধর্মের বিশেষত শহরে কিন্তু ব্যাপক চরিত্র বদল ঘটে গেছে ফলত হিন্দুত্ব ঠেকাতে হিন্দু ধর্মের বৈচিএ সহায় হতে পারে কিন্তু তার উপর নির্ভরশীলতা নিশ্চিতভাবেই আত্মঘাতী হবে। পরিস্থিতি দাবী করে এমন রাজনীতির যা একই সঙ্গে হিন্দুত্ব তথা সব মৌলবাদকে নির্মূল করবে, জাতপাতের হিংস্রতা ঘোচাবে আর উপমহাদেশের রাজনীতিকে জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের পশ্চিমি আখ্যানের বাইরে নিয়ে আসবে।

বরং এভাবে কি দেখা যায় যে হিন্দুত্ব নিজ অজ্ঞাতে তার প্রকৃত বিরোধীদের সামনে, যদি তাদের রাজনৈতিক সৃজনশীলতা থাকে, তবে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভুল শোধরানর সুযোগ ও দায় এনে দিয়েছে? যা প্রথমত স্বীকার করে নিলে উপমহাদেশের জাতি-রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদের চেহারা চরিত্র বদলে যাবে? ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতি তত্ত্ব কত বাতুল ছিল তা যথার্থভাবে ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে বাঙালী সত্তার স্বাধীনতার দাবিতে বাংলাদেশের জন্মে প্রমাণ

হয়েছে। তারপর তিনিটি জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েও উপমহাদেশের নিস্তার নেই কেন সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে? হিন্দুত্বকে আজ ধন্যবাদ জানাতেই হয় উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে যদি বাঁচতেই হয় তাকে আনখশির নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে, বাধ্য করছে তাকে জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রর কাঠামোকে প্রশ্ন করতে, তার বাইরে পা রাখতে। হিন্দুত্বকে ধন্যবাদ ধর্ম নিরপেক্ষ কি স্তালিনপরায়ন বামেদের মসিহা রূপ অপ্রাসঙ্গিক করে দিচ্ছে – উপমহাদেশ জুড়ে হিন্দু, মুসলিম সকলকে একমাত্রিক ধর্ম পরিচয়ের বাইরে বেরোতে বাধ্য করছে, উপমহাদেশ জুড়ে নিজের অজান্তে কোন ঐক্যের সম্ভাবনা তৈরি করে যাচ্ছে। ধন্যবাদ হিন্দুত্ব, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভুল শোধরানোর, ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির নতুন করে মূল্যায়নের প্রকৃত সুযোগ এনে দেবার জন্য।

যা হোক পথের কাঁটা তো সশরীরে দূর হলেন, ১০০ খণ্ডের রচনাবলী হয়ে ঠাই পেলেন লাইব্রেরিতে, সবার জন্যে ছবি হয়ে কাগজর নোটে, বাৎসরিক ড্রাই ডে হয়ে দিন মজুর মদ্যপের বিরক্তিতে। বামেরাও ‘সমীকরণ আপনি হবে/কোন এক অমোঘ অনিবার্য মুহূর্তে’ জেনে নির্বাচনে মন দিলেন। ৭৩ বছর ধরে জাতি-রাষ্ট্র আধুনিকায়নের পথ ধরে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা? এ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীর রাজনীতি, জীবনদর্শনের তাৎপর্য সমকালের জন্য কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা দেখে নিলে ভারতীয় উত্তর পেতে সুবিধা হবে। অন্যথায় ‘প্যারামিটার’ সর্বস্ব এক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে না ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার চরিত্রগত বদল, নিশ্চিতভাবেই হদিশ মিলবে না জীবনযাপনের কোন ভারতীয় বিকল্প।

জাতীয়তাবাদে এক অনাগরিক আগন্তুক

সংক্ষেপ করার ঝুঁকি নিয়ে বলা যায় রাজনৈতিক গান্ধীর জন্ম ও উত্থান দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৃত্তের বাইরে। এর ফলে ওনার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশের আধুনিকতা পোষিত উন্নয়ন, শিক্ষা প্রভৃতি ধারনাকে মূল ধারার বাইরে থেকে দেখা, বোঝা, সহায় হয়েছিল ওর ধর্মবোধ – মূলত মায়ের সূত্রে পাওয়া বৈষ্ণব চেতনা। ১৯১৫ সালে যখন উনি ভারতে স্থায়ীভাবে ফিরছেন চিন্তাভাবনায়, জীবন চর্চায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে আদ্যন্ত অনাগরিক এক আগন্তুক।

ইতিমধ্যে উপনিবেশে পশ্চিমের জাতীয়তাবাদের পাঠ একরকম সম্পূর্ণ ও সফল – কাম্য, ব্যবস্থা সহায়ক বিরোধীসকলের জন্মও হয়ে গেছে এবং তারা ঐ পাঠ মিলিয়ে উপনিবেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিবেদিত প্রাণ। উপনিবেশের স্বাধীনতা যোদ্ধারা জাতীয়তাবাদী গণজাগরণ ঘটাতে নিজেদের অক্ষমতা ওর অনাগরিক আগন্তুক চরিত্রের রাজনীতি দিয়ে, যা আদ্যন্ত জাতীয়তাবাদের ভারতীয় বিকল্প, মিটিয়ে নিল। কিন্তু রাজনীতি, জীবনদর্শন বাবদ গান্ধী জাতীয়তাবাদের কাছে এক উৎকেন্দ্রিক আগন্তুক রয়ে গেলেন এবং তা ওর ঐ নিখাদ ভারতীয় চরিত্রের কারণে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর লগ্নে যার দায় ঝেড়ে ফেলতে নেতারা কিছুমাত্র দ্বিধা করলেন না। স্বঘোষিত সনাতন হিন্দু গান্ধী কখনোই ধর্মকে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে ব্যাবহার করেন নি, বরং মতাদর্শের অতি নির্দিষ্ট ছাঁচ যা যে কোন মতাদর্শিরা বয়ে বেড়ায় আদ্যন্ত তার বিরোধী। হিন্দু ধর্মের সীমাহীন বৈচিত্র্যকে মূল্যবান জ্ঞান করতেন। বর্ণভেদে বিশ্বাসী (ওর বর্ণভেদ কিছু থাক-বন্দী নয়, পেশা ভিত্তিক, বাস্তবে তা কিন্তু তা থাক-বন্দী ব্যবস্থাই) আবার অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী, ওর কাছে কোন অপরই বাইরে অপর নয় বরং আত্তীকৃত অপর যার সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভবই শুধু নয়, উচিৎও বটে। ওর রাজনীতি ধর্মাধর্মের ন্যায় বোধ চালিত। তিনিই প্রথম সাম্রাজ্য পোষিত শহুরে এলিট-লালিত ছকের বাইরে বেরিয়ে সমস্ত শ্রেণী-জাত-ধর্মের মানুষের স্বাধীনতা অন্দোলনে যোগদান সম্ভব করে

তোলেন। ওর আন্দোলন শুধু অহিংস পথে সাম্রাজ্য বিরোধিতাই নয়, ব্যক্তির জন্য আত্মশক্তিতে ভর করে সামাজিক ভেদাভেদ শূন্য স্বদেশ নির্মাণেরও ব্রত। প্রকৃত প্রস্তাবে ওর রাজনীতির এই ব্যক্তিগত ব্রত ধর্মীতাই আচন্ডাল ভারতবাসীকে রাজনীতিতে যোগদানের, দরকারে একক উদ্যোগে স্বদেশ নির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছিল আর পরিণতিতে সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল।

তিনি আজ পর্যন্ত প্রথম ও শেষ, হিন্দুত্ব কি ধর্ম নিরপেক্ষর চির দুঃস্বপ্নের সহজিয়া ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যের যেখানে সবচেয়ে বড় সাফল্য তা হল তার কাম্য বিরোধী নির্মাণ। গান্ধীর সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং আজও অক্ষুণ্ণ তাৎপর্য এই যে তিনি সাম্রাজ্য নির্মিত কাম্য বিরোধী নন, স্বনির্মিত সাম্রাজ্য বিরোধী। তিনি প্রথম ও আজ পর্যন্ত একমাত্র জাতীয় নেতা যিনি উপনিবেশের জন্য সাম্রাজ্য পোষিত সভ্যতার আত্মধবংসি রূপ নিজস্ব সংবেদানশীলতায় বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার বাইরে ভারতীয় ঐতিহ্যে স্থিত থেকে প্রতিস্পর্ধী ভারতীয় বিকল্প নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন যা ওঁর অনুগামীরা কিছুমাত্র বোঝেননি এবং তার শরীকও ছিলেন না। তারা ছিলেন হিন্দুত্বের মতনই সমান ভাবে এই সাম্রাজ্য পোষিত সভ্যতার উপজাত এবং তাকেই ধ্রুব-জ্ঞান করা সাম্রাজ্য বিরোধী। ফলে সাম্রাজ্য, ধর্মীয় কি ধর্ম নিরপেক্ষ সব কিসিমের নেতাদের কাছে গান্ধী ছিলেন অবোধ্য, অবাধ্য ব্যক্তি যাকে স্বীকার কি অস্বীকার কিছুই করা যাচ্ছিল না। আধুনিকের ও সব রাজনীতিকদের কাছে আজও ব্যাপারটা একই রকম থেকে গেছে।

গান্ধী মূল ধারার রাজনীতিতে ভারত জুড়ে একমাত্র জাতীয় নেতা যার ডাকে দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হয় আবার যার কথায় তা স্তব্ধও হয়ে যায় কারণ তা ঘোষিত অহিংস নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ওর কাছে অহিংসা উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি দুইই, প্রকৃতপক্ষে ওর রাজনীতিতে পথ ও গন্তব্য অবিভাজ্য। বুঝেছিলেন উপনিবেশে জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্র আদতে এক আমদানিকৃত বস্তু যা ভারতীয় সভ্যতার চরিত্র বদলিয়ে দিচ্ছে। এই ধার করা জিনিষে স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত উপনিবেশে সাম্রাজ্য পোষিত সভ্যতার উপজাত এবং আপাত প্রতিস্পর্ধী হলেও আদতে তার সহায়কই ছিল। রাজনীতি, উন্নয়ন, স্বদেশ ভাবনা সবেতেই নিয়ে আসলেন পশিমি আধুনিকতার বিকল্প এক ভারতীয় ভাবনা। ওর অহিংসা, অসহযোগ, সত্যাগ্রহকে সামলানোর কোন রাজনীতি কি প্রশাসনিকতা উপনিবেশের প্রভুর জানা ছিল না। ওর রাজনীতির সূত্রেই ভারত তার হারাতে বসা বৈচিত্র্যে উন্মুখতা, সহমর্মিতা, নির্বিবাদ সহাবস্থান জাত অপরকে আত্মগত করে আত্মতা গঠনের হদিশ পেল বটে তবে তাকে নতুন করে আত্মগত করতে পারলো না – তা ঐ বাবুদের আমদানিকৃত, ততদিনে গেরস্থ মধ্যবিত্ত মহল্লায় শিকড় ছড়িয়ে যাওয়া, ধ্রুব-জ্ঞান করা আধুনিকতা আর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কল্যাণে।

উনি ছিলেন এমন আদ্যন্ত ধর্মীয় সংস্কৃতি আর উৎপাদন রীতির বিচিত্রে ভরা কৃষি-সমাজের নেতা যার সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস তার ঔপনিবেশিক প্রভুর থেকেও হাজার খানেক বছরের পুরনো। গোষ্ঠী/কৌম সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা উদীয়মান, সমাজে তার সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলেনি। উপনিবেশ হয়ে থাকার ফলে কৃষি-সমাজ ভাঙনের মুখে এবং তাকে বাধ্যতামূলকভাবে আধুনিকতার দিকে পা ফেলতে হচ্ছে। মানুষের স্বাভাবিক দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম তখনো প্রাতিষ্ঠানিক জাতীয়তাবাদ সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। ধর্মনিষ্ঠের স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধ চালিত ওর রাজনীতি গোষ্ঠী/কৌম সত্তাকে ব্যক্তি সত্তার তুল্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করতো, অহিংসা, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ এ সবই একই সঙ্গে পথ ও পাথেয়, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি। গান্ধী মানে

সীমাবদ্ধতা, স্ববিরোধিতায় ভরা আদ্যন্ত এক অ্যানার্কি যেখানে ব্যক্তির চূড়ান্ত সততা স্বচ্ছতাই প্রধান কথা। পুঁজির অনিবার্য বৈষম্য, ক্ষমতার রাজিনীতির অমানবিকতা, পুঁজির সংস্কৃতি বলতে 'ধনের উপচে পরা ইতরতা', গোষ্ঠী/কৌম সত্তার বিলোপ এসবই বুঝতেন। ওর রাজনীতি এসবেরই বিরোধিতা আর তার বিকল্প বলতে মনে করতেন দেশজ সংস্কৃতি সংলগ্ন, প্রকৃতি, পরিবেশ বাঁচিয়ে, 'বস্তু বিরল' এক জীবনযাপন। ব্যবস্থ্ বদলের পথ ব্যক্তির সচেতন, স্বউদ্যোগি আত্মসংযম।

মজুরি-শ্রম-পুঁজির চক্র তার থেকে মানুষের নিজ সত্তার ক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতা পরিষ্কার বুঝতেন তেমনটা বলা যায় না। ওনার সাম্রাজ্য বিরোধিতা যত আপোষহীন র‍্যাড়িক্যাল এবং মৌলিক যার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দরবারি ছকের বাইরে এনে ব্যাপক জনসমাবেশ সম্ভব করতে পেরেছিলেন, ভারতের জাতপাতের হিংস্র অমানবিকতা ঘোচাতে ততটাই ব্যর্থ ছিল। আজ গান্ধীর রাজনীতি কি জীবনদর্শন আধুনিকতার হিংস্রতার বিরুদ্ধে যতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিচ্ছে, দলিত উত্থানের জন্য ততটা সহায়ক হিসাবে গ্রাহ্য হচ্ছে না। এবং তার কারণও আছে। যাহোক দলিতদের অধিকারের প্রশ্নে কিছু মাত্র অসংবেদনশীল ছিলেন না, কিন্তু তার জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার অক্ষমতা ছিল, হরিজন নাম দিয়ে নিজ বুকে টেনে নিলে হাজার হাজার বছরের হিংস্রতা সমাজ থেকে দূর হয় না।

এ ব্যাপারে অম্বেদকরকে যতই আইকন ধরা হোক না কেন উনিও কিছু দিক দিশারী নন। উনি যে স্বাধীন ভারতে ভোটে হেরেছিলেন দলিত কেন্দ্র থেকেই তা কিছু বিনা কারণে নয়। ওনার এবং সব দলিতের স্বপ্নের আধুনিকায়ন, নগরায়ন দলিতদের উত্থান সহায়ক হবার কথা ছিল না, হয়ও নি। শুধু দলিতদের মধ্যে এক সংরক্ষণের সুবিধাভোগী স্তর তৈরি হয়েছে যারা নিজ গোষ্ঠী থেকে ক্রম বিচ্ছিন্ন। আম্বেদকর জীবনের শেষ লগ্নে উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামের দলিতদের অধিকার রক্ষায়, হাল ফেরাতে কিছু করতে পারেন নি। ওনার মতো মানুষদের স্বপ্নের সাংবিধানিক নৈতিকতা আজও ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজের অনায়ত্ত থেকে গেছে। তবে এও অনস্বীকার্য ভারতে দলিত প্রশ্নটিকে উনি বাম বাদে সব রাজনীতির পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব করে দিয়ে গেছেন। এবং এও অনস্বীকার্য উপনিবেশের প্রভুর দান আধুনিকায়িত ভারতে সাম্প্রদায়িকতা, দলিত পীড়ন অচ্ছেদ্য রয়ে গেছে। আর পাঁচজন জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যে বিরোধীর মত আম্বেদকরও ছিলেন আদ্যন্ত পশ্চিমি আধুনিকতার সন্তান। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গ জাত পাতের হিংস্রতাকে, প্রথম না হলেও, যথার্থভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন, গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সঠিকভাবেই সরব এবং গান্ধীর মতই দলিত বিরোধী হিংসার সমাধানে সমানভাবে ব্যর্থ। উনি কিন্তু দলিতের জন্যে সংরক্ষণের জড়িবুটি, এবং তা আত্মসম্মানের মূল্যে, ছাড়া আর কোন দিশা দিতে পারেন নি যার কার্যকারিতা আজ যথার্থভাবেই প্রশ্ন সাপেক্ষ। গান্ধীর অন্তত এই কাণ্ডজ্ঞান ছিল যে 'Affection cannot be manufactured by law'।

দলিত নেতা নয়, আর পাঁচজন জাতীয়তাবাদী নেতার মত জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দেশভাগের সমর্থক আম্বেদকরের নেতৃত্ব সংবিধানে পশ্চিমি অনুকরণে জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি যত ঠাই পেল তার সাংস্কৃতিক দিক যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি মূলধারা হিসাবে স্বীকৃত ছিল প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই ঠাঁই পেল। এবং এর মূল্য রাজ্য গুলকে আজও মেটাতে হচ্ছে। এই রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের কল্যাণে ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে সরে ভারসাম্য-হীনভাবে শক্তিশালী কেন্দ্র

তৈরি হল, রাজ্যগুলকে প্রায় সব ব্যাপারে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী করে রাখল। সাম্রাজ্যের শেষ সাফল্য তার মৌলিক বিরোধীর সতর্কতাকে উপেক্ষা করে স্বাধীন ভারতের সংবিধান হয়ে উঠল ‘English rule without English men’; একেই-কি বলে ইতিহাসের পরিহাস যে বর্ণ হিন্দুর আধিপত্যে আঁচর না কাটা এ সংবিধান রচিত হল এক দলিতের নেতৃত্বে? আরও যা এ সংবিধানের দুই তৃতীয়াংশ India Government Act 1935 থেকে, বাকি এদিক ওদিক সেদিক থেকে। হায় স্বাধীন হয়েও বাবুরা আটকে থাকলেন ধার করা জাতীয়তাবাদের মত ধার করা সংবিধানে! এই হল আটলান্টিকের দুপাড় থেকে Ph.D জোগাড় করা বিদ্বানের সাংবিধানিক সৃজনশীলতা! বলতেই হচ্ছে উনি আইকন কারণ উনি আইকন।

গান্ধী ছিলেন এমন এক রাজনৈতিক নেতা যার কাছে ধর্ম এবং রাজনীতি বিচ্ছেদযোগ্য, স্বতন্ত্র পরস্পর বিরোধী ধারনা ও চর্চার বিষয় নয়। ওর ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক অনুগামীদের জন্য ওর ‘কুখ্যাত’ উক্তি ‘যারা ধর্ম আর রাজনীতিকে পৃথক করতে চায় তারা কোনটাই বোঝে না’। হিন্দুত্ব যেন গান্ধীর এই কথাটা কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে ধর্ম-রাজনীতির অচ্ছেদ্য গ্রন্থি বেধেছে। ধর্ম নিরপেক্ষ কি বামেরাও চিরকাল এমন গ্রন্থি বেঁধেছে, যদিও অপ্রকাশ্যে, ভারতে ভোটের রাজনীতিতে এটাই প্রতিষ্ঠিত রীতি। হিন্দুত্ব নেহাত আকাঠ অথবা জানে গান্ধীকে ছেটেকেটে না নিলে ব্যাবহার বিপজ্জনক। কিন্তু ওরা যদি এই বাক্যাংশটি ব্যাবহার করে বিরোধীদের উত্তর কি হবে? স্বঘোষিত গান্ধীর উত্তরাধিকারীরা নিশ্চিত তোতলাবে, আর বামেদের তো ওর নামের বানান ছাড়া কিছুই জানা নেই, অবশ্য ধর্ম নিরপেক্ষদের আধুনিক রিচুয়ালের কল্যাণে ওর জন্ম মৃত্যু তারিখ সকলেই জানে (ওর জন্মদিন জাতীয় ড্রাই ডে, পৃথিবীর কোন ‘জাতির জনকের’ জন্যে এমন মৌলিক সম্মান দেখানোর রীতি নেই। ধর্ম নিরপেক্ষদের এহেন মৌলিকতার জন্যে ধন্যবাদ না দিলে অন্যায় হবে)।

ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিক্ষিত বুলি যে ভোটে কাজে দিচ্ছে না তা মনে হয় এরা নজরে নিতে একান্তই অক্ষম অথবা এও হতে পারে অন্য কোন রচনা মুখস্থ নেই ফলে প্রশ্ন বদলে গেলেও ঐ একমাত্র মুখস্থ রচনাই আওরাতে হচ্ছে। ওরাই বা কি করে জানবে হিন্দুত্ব ভোট কুড়নোর খেলাকে চেনা সিলেবাসের বাইরে নিয়ে যাবে! হিন্দুত্ব যেখানে হিন্দুদেরও ফাঁকি দিচ্ছে, বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুদের, তা নিয়ে আবার কথা বলা যাবে না। কয়েক পুরুষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম নিরপেক্ষ সতীত্ব ভোটের বাজারে বেচা যায় ঠিকই কিন্তু তাতে যে বাবুদের খেই হারানো ‘লৌকো বিলেস’ ফের ঠিক তানে শুরু হবে তার নিশ্চয়তা কই! হায়, পালা ফেরাতে তবে কি ধর্ম নিরপেক্ষ ও বামেদের যথাক্রমে ঈশ্বর ও ইতিহাসের দ্বারে হত্যে দেওয়াই একমাত্র নিয়তি! যা হোক আপাতত স্বখাতসলিলে ডোবা হিন্দুত্বের কাম্য বিরোধীদের ছেড়ে গান্ধী পাঠে ফেরা যাক, দেখা যাক আজ নির্বিকল্প হয়ে যাওয়া জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের আধুনিকতার অতি নির্দিষ্ট, সীমিত, নিষ্প্রাণ পরিসরের বাইরে কোন সম্ভবপর সৃষ্টিশীল বিকল্পের (সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের জন্যই) সন্ধান মেলে কিনা।

গান্ধীর এই উক্তি কোন আধুনিকের প্রশ্নের উত্তরে এবং নিশ্চিতভাবেই তা আলটপকা নয়, ওর রাজনীতি তার সাক্ষ্য দেয়। উনি ধর্ম ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্যতার কথা বললেও তা কিন্তু কোনভাবেই ধর্মীয় পরিচিতি ভিত্তিক রাজনীতির কথা নয়। তবে কিভাবে একে বুঝে নেওয়া যেতে পারে যা ওর রাজনীতির সার এবং সাফল্যও বটে? এই সূত্রে হয়তো আভাস মিলতে পারে ভারতে জাতীয়তাবাদ বলতে কেন ধর্ম নিরপেক্ষতা বোঝায়। গান্ধীর ধর্মবোধ কিছু আধুনিকের ধর্মপাঠ নয়, তা সনাতনী হিন্দুয়ানা যেখানে আত্মতা নির্মাণের জন্য অপর নিতান্ত জরুরি, তাকে

আত্মগত না করতে পারলে নিজের গন্ডিবদ্ধতা ঘোচেনা, ফাঁক থেকে যায় নিজেকে চেনায়। ফলে ধর্ম কখনই হয়ে ওঠে না পরিচিতি ভিত্তিক দেওয়াল। উনি ধর্মকে দেখতেন জীবন যাপনের এক পথ হিসাবে, কোন মতাদর্শ হিসেবে নয় (Religion as way of life not as ideology)। ওর কাছে ধর্মের কোন বিকল্পের অনুপস্থিতে তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে অনিবার্য ও অপরিহার্য।

ব্রিটেনে আইন পড়তে গিয়ে উনি ব্রিটিশ রাষ্ট্র-রাজনীতির ধর্মনিরপেক্ষ রূপ কাছ থেকে দেখেছিলেন। পরে দ্বিতীয়বার ব্রিটেন যাওয়ার সূত্রে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল ওর ভবিষ্যৎ হত্যাকারীদের মাথা সাভারকরের সঙ্গে, যিনি তখন স্বদেশে সশস্ত্র আন্দোলন রফতানি করার মহৎ কর্মে নিষ্ঠ। এসব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন উন্নয়নের আধুনিকতা ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-রাজনীতি যৌথভাবে ব্যক্তিকে কৌম ও ধর্মের নিংড় থেকে মুক্তি দেয় বটে কিন্তু সে স্বাধীনতা তাকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতান্ধ, আগ্রাসী, আত্মসর্বস্ব, হননোদ্দত করে তোলে। মঙ্গল-অমঙ্গলের বোধহীন আধুনিকের ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি ক্ষমতার জন্ম দেওয়া ও তার নিখুঁত প্রয়োগের কৃৎ-কৌশল হয়ে ওঠে। আধুনিক রাজনীতির এ হন্তারক রূপ ইউরোপের জাতীয়তাবাদ বাকি পৃথিবীতে উপনিবেশ প্রসারে সহায়ক হয়েছে। ওনার কালে নীতি-নৈতিকতা, মঙ্গল-অমঙ্গলের উৎস ধর্মাশ্রিত কৌম। পশ্চিমের ধাঁচে রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে গেলে কৌম সত্তাহারা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-বাধ্য ব্যক্তির জন্ম দেবে, আঘাত আসবে কৌমের উপর এবং শেষ পর্যন্ত কৌমের অনুপস্থিতি ব্যক্তিকে শুধু নিঃসহায়ই করবে না তাকে নীতিবোধ শূন্য, ক্ষমতান্ধও করে তুলবে। হাজার বছরের বেশি ভারতীয় বর্ণপ্রথার থাকবন্দী ব্যবস্থার সামাজিক অসাম্য ঘোচাতে হিংসার প্লাবন আসবে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতে যা নিত্যই ঘটে চলেছে। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মাঝে কৌমের মত কোন সামাজিক কাঠামো না থাকলে তা যে কারোর পক্ষেই শুভ হয়না তা কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র-রাজনীতি দেশে দেশে নিয়ত প্রমাণ রেখে চলেছে। আধুনিক জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পক্ষে অন্ধ ক্ষমতার তন্ত্র হয়ে ওঠা আটকাতেই কি উনি রাজনীতিতে ধর্মের নীতি-নৈতিকতা বোধ আনতে চেয়েছিলেন? তাই কি ওনার কাছে রাজনীতি ও ধর্ম অবিচ্ছেদ্য?

তবে উনি ধর্মকে যেভাবেই বুঝুন না কেন তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্তার বন্ধকী কারবার, মানুষকে যূথবদ্ধ করলেও ব্যক্তিকে রিক্তই করে। তবে যূথবদ্ধ করতে গিয়ে সে ব্যক্তিকে ন্যায়-অন্যায়ের পাঠও দেয়। ধর্ম মনুষ্য সৃষ্ট হয়েও তার কাছে তা স্বরাট হয়ে দেখা দেয়, হয়ত তা ঐ সত্তার বন্ধকী বাবদ নিঃস্ব হওয়ার কারণে। ধর্ম অনেক দূর পর্যন্ত তাকে নিয়ন্ত্রণও করে, জীবনের দিক দিশা যোগায়। আপাত স্বরাট হয়ে উঠে তা মানুষের নানা বিধ প্রজাতিগত আর্তিকে মেটায়। প্রথামত তা মানুষের আত্মধ্বংসি প্রবণতা, বিবিধ প্রবৃত্তির তাড়নাকে সামলাতে সাহায্য করে এবং আরও যা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তার দেশকালে সীমিত জীবনে অধরা, তাৎক্ষনিকের গণ্ডির বাইরে, কোন মহাজাগতিক অনুভূতি, অভিজ্ঞতা চায়। ধর্ম তার জীবনে তেমন transcendental-এর আশ্বাস, অনেকের জন্য তা ধর্ম সূত্রে সম্ভব হয়ও বটে। অনস্বীকার্য এমন transcendental-এর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা মানুষের শিল্প, সাহিত্য, সংগীত মেলে কিন্তু মহাকাব্যগুলি বাদ দিলে শিল্প, সাহিত্য, সংগীতের সূত্রে সাধারনজনের এমন অভিজ্ঞতার আস্বাদন সম্ভব হয় না।

উল্টো দিকে রাজনীতি অতীব মাটি পৃথিবীর জিনিষ, বিবিধ সামাজিক অর্থনৈতিক অসাম্য ঘোচানোর উদ্দেশ্যে মানুষকে সমবেত করে, ধর্মের সঙ্গে কোন সংঘাতে না গিয়ে, যেহেতু তা ধর্মের মত মানুষের কোন প্রজাতিগত

আর্তি মেটাতে চরিত্রগতভাবেই অক্ষম, বরং ধর্মের নীতি-নৈতিকতা, মঙ্গল-অমঙ্গলের বোধ চালিত হয়ে, ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক সাম্যের পথে, দরকারে এককভাবেই উদ্যোগী হতে তাগিদ দেয়, সহায় হয়। এভাবে দেখলে রাজনীতি মানুষকে ধর্ম পরিচয়ের সংকীর্ণতার বাইরে এনে তাকে মানব ধর্মের বড় দিগন্তে এনে দাঁড় করাতে পারে, যেখানে 'মানুষ' এই বড় পরিচয় সে বিনা শর্তে খোলা হাটে নিজের আত্মতা নির্মাণ করে নিতে পারে যা ধর্মের নিগড়ে প্রায়শই সম্ভব হয় না অথবা একরঙা একমাত্রিক হয়ে ওঠে। অথবা রাজনীতির চরিত্রে এমন কিছু কি অচ্ছেদ্য ভাবে সব সময় থাকে যা অপরের অপরত্বকে আত্মগত করার পথে বাঁধা? ফলে নির্বিবাদ সহাবস্থান জাত ধর্মের কারণে যা সম্ভব হয় রাজনীতির কারণে তা অসম্ভব হয়ে ওঠে, আবার এই অপরকে আত্মগত করা ছাড়া সভ্যতা সম্ভব হয় না। তবে কি রাজনীতিতে ব্যক্তিগত ব্রত ধর্মীতা কেবল ধর্মের সুত্রেই আনা যায়? সন্ধেহ নেই ধর্ম-সুত্র ছাড়াই রাজনীতিতে ব্যক্তিগত ব্রত ধর্মীতা নিয়ে আসার উদাহরণ ইতিহাস জুড়ে আছে। তবে রাজনীতিতে যে মতাদর্শের অনড় কাঠামোর বাইরে নমনীয় ব্যক্তিগত ব্রত ধর্মীতা আজ নিয়ে আসতেই হবে, অন্যথা রাজনীতির চলতি ছক ভাঙ্গা যাবে তা নিশ্চিত। সন্দেহ নেই গান্ধী উবাচকে আরও নানাভাবে বোঝাপড়া সম্ভব ও তার ভিত্তিতে ধর্ম রাজনীতির সম্পর্ক নির্ধারণ সম্ভব। আজ তা অতি জরুরীও বটে। উপমহাদেশে রাজনীতিকে পশ্চিমের ধাঁচে ধর্ম নিরপেক্ষ করতে গিয়ে রাজনীতির সূত্রে ধর্মের সত্তার বন্ধকী কারবার ঘোচেনি, বরং স্ব স্ব রাজনৈতিক পতাকার নীচে সমবেত করতে গিয়ে মানুষকে আরও এক দফা সত্তা শূন্য সংকীর্ণ পরিচয়ে বেধেছে, শিবির নির্বিশেষে আমাদের আধুনিক রাজনীতিতে অপরের অপরত্বকে আত্মগত করার কোনো দিশা কি কল্পনা কোনো কালেই ছিল না, যদিও তা ভারতীয় সভ্যতর এক চিরকালীন চরিত্র। ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতবাসীর জন্য ধীরে ধর্ম ও রাজনীতি দুইই হয়ে উঠেছে সহযোগী হন্তারক।

একটি জরুরী অভিজ্ঞতা হল উপমহাদেশে জাতি-রাষ্ট্র যদি কায়ক্লেশে ধর্ম নিরপেক্ষ হয়ও, পশ্চিমি কি এদেশি যে অর্থেই হোক, সমাজ কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারে না, কোন অর্থেই নয়। যা সে হতে পারে, হওয়া উচিৎ এবং উপমহাদেশে ছিলও বটে তা হল ধর্মীয় বিশ্বাসের, আচরণের বৈচিত্র্যের প্রতি পারস্পরিক সহিষ্ণুতা। ধর্ম ও রাজনীতির অনভিপ্রেত জোট বন্ধনে, নেতাদের গদি বিলাসে ও পুঁজির প্রেরণায়, উপমহাদেশ তার বৈচিত্র্য সহিষ্ণুতা হারাল সঙ্গে উপরি পাওনা ভারতীয় সভ্যতা পশ্চিমি সভ্যতা আর জাতি-রাষ্ট্রের হাত ফেরতা দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে আটকে রইলো। অথচ আজও ভারতীয় সভ্যতা বলে কিছু অবশিষ্ট আছে এবং তা পশ্চিমি সভ্যতার বিকল্প ধারা হবার ক্ষমতা রাখে, যার সন্ধান ও সূত্র গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন। আমদানিকৃত আধুনিক, ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির তত্ত্বাবধানে যার গঙ্গা যাত্রা একরকম নিশ্চিত করা হচ্ছে, দল নির্বিশেষেই। এদেশেই গান্ধীর জন্ম, রাজনৈতিক পরিপক্কতা, খুনও হওয়া, শেষে 'জাতীর জনকের' স্বীকৃতি পাওয়া। সত্যি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি। আরও একবার স্বীকার্য কবিরা ক্রান্তদর্শী বটে।

আচ্ছা উনি যদি স্বভাবজ একগুঁয়েমিতে স্থিত থাকতেন দেশভাগ বিরোধিতার প্রশ্নে তবে কি উপমহাদেশের চালচিত্র অন্য রকম হতো? যদি আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতেন সংবিধানের চরিত্র কি অন্যরকম হতো, যথা ধরা যাক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতার সঙ্গে গোষ্ঠী বা কৌমের সত্তাও স্বীকৃতি পেতো? আমাদের রাজনীতি কি দেশের জল হাওয়া থেকে এতদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমি খাতে বই তো? পুঁজির অনিবার্য সন্তান শ্রেণী সংগ্রামের স্বীকৃতি থাকতো রাজনীতিতে? রূপ কি হতো? নির্মলকুমার বোসের মতে ওর ট্রাস্টিশীপের স্বাভাবিক পরিণতি সমাজতন্ত্র, তত দূর কি উনি রাজি হতেন? আরও যা গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতার চির অবসান কি জাতি-রাষ্ট্রের বিকল্প কিছু কি দেখতে

পেতাম? এমন খেয়ালি নানা প্রশ্ন গান্ধীকে ঘিরে করা যেতে পারে। না পিতার কাছে পথের হদিসের জন্য হত্যে দেওয়া নয়, আসলে প্রশ্নগুলো গান্ধী নিরপেক্ষভাবে নিজ তাৎপর্যে জরুরী কিনা তাই বিবেচ্য। অনস্বীকার্য প্রশ্নগুলোর উৎসে গান্ধীর রাজনীতির সাফল্য ও উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদের 'অগ্রগতির' ইতিহাস।

সাকিন হাটখোলা

দ্বিজাতি তত্ত্বের উৎসে যেমনটা দেখা গেল একমাত্রিক ধর্ম ভিত্তিক পরিচিতিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী দাবি। এখন সমাজের সব রকম বৈষম্য ঢাকতে, শ্রেণী স্বার্থে ধর্ম ভিত্তিক জন সমাবেশের সাফল্য আজও উপমহাদেশে প্রশ্নাতীত। তার মূল্য চোকায় সাধারণ জন, আদতে মানুষের বড় পরিচয়ের ভুল উত্তর ধর্ম, ক্রমে যে তা তাকে পরিচিতির ছোট বৃত্তে আটকে রাখে তা খেয়ালে আনতে তার বেলে গড়িয়ে যায়। ততদিনে পরের কয়েকটি প্রজন্ম সংক্রামিত। ধর্ম ভিত্তিক একমাত্রিক পরিচিতির রাজনীতির সুপক্ক ফল যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে জাতী-রাষ্ট্র তার অপরিহার্য সহায় জাতীয়তাবাদী গণ উন্মাদনা। ধর্মাশ্রিত জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ আজ উপমহাদেশে একতম জাগ্রত গণদেবতা, তার নিত্য অন্নকূট পার্বণ সারা হয় সংখ্যালঘুর (শুধু ধর্মার্থে নয়) রক্তে। এ দেবতা যেহেতু চরিত্রে গণ, কোন নন্দিন-এর সাধ্য নেই তার চেতনা ফেরায়। তবে কি বিকল্প বলতে গত শতকের মত শ্রেণী চেতনা আশ্রিত গণদেবতাকে জাগ্রত করা? তা যে শেষ পর্যন্ত দমন পীড়নেরই ধর্ম নিরপেক্ষ কল কব্জা তা তো গত শতকেই প্রমাণিত, এবং তার একটি নিশ্চিত কারণ চরিত্রগত-ভাবে একমাত্রিক পরিচিতির রাজনীতি যার সঙ্গে আজকের জাতীয়তাবাদী মৌলবাদের গভির মিল অতি প্রকট। ব্যক্তি-কৌম-শ্রেণী-লিঙ্গ-স্বদেশ কোন সত্তারই যেহেতু একমাত্রিক পরিচিতি নেই, তথাপি পুঁজি ও আধুনিকতার দাবি মেটাতে গিয়ে রাজনীতি এই সব সত্তার প্রাথমিক একমাত্রিকতাকেই করে তুলেছে তাদের ধর্ম, তাদের পরিচয়। এই আরোপিত একমাত্রিক পরিচয়ের বাইরে কিভাবে বেরোনো যায় যা আজ উপমহাদেশের জন্য নিতান্তই জরুরী? কারণ তবেই গণদেবতা হয়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের অন্নকূট পার্বণ শেষ হতে পারে।

এ বাবদ দুটি কেজো প্রস্তাব, ধার করা এবং পরিক্ষিত। কাজ দুটি সম্পূরক এবং একদা মিনু মাসানির প্রস্তাবিত উপমহাদেশ জুড়ে কনফেডারেশনেরও, যা আজ অত্যন্ত জরুরী, সহায়ক। দুটি কাজই একসঙ্গেই এখনই শুরু করা যায়। দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল্য চোকাতে যে দেশভাগ, কোন না কোন ভাবে তার মূল্য চুকিয়ে বা তার রক্তাক্ত স্মৃতি বয়ে বেড়ানো অথবা তেমন স্মৃতির দ্বারা সংক্রামিত কিছু প্রজন্ম আজও উপমহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং এদের সূত্রেই কাজ দুটি অনেক সজীব ভাবে শুরু হতে পারে। প্রথমত দরকার ভারতীয় উপমহাদেশ ভেঙে তিনিটি জাতী-রাষ্ট্র হওয়ার ভয়াবহ ইতিহাস যা প্রতিটি রাষ্ট্রেই নিত্য পুনরুৎপাদিত হয়ে চলেছে যৌথভাবে তার ইতিহাস রচনা। এই ইতিহাসের আলোতেই উপমহাদেশের মানুষ ক্রমে জাতীয়তাবাদী হানাহানির বাইরে আসতে পারবে এবং উপমহাদেশের সভ্যতা সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাসের পটে নিজেকে, নিজেদেরকে দেখতে পারবে। এই সেদিনের দেশ ভাগাভাগি যে কিছু স্বাভাবিক বা চিরকালীন নয় তা বোঝা যাবে। এ কাজের উপযুক্ত ইতিহাসবিদ তিনটি রাষ্ট্রেই রয়েছে ফলে তা এখনই শুরু করা যায় ও উচিৎ। যেহেতু তিনটি রাষ্ট্রের কোথাও সভ্য শিক্ষিত সরকারের কোন সম্ভাবনা অদূর কি দূর ভবিষ্যতে নেই তাই গণ উদ্যোগে তা এখনই শুরু করা দরকার। উদাহরণ, হানাহানির জাতীয়তাবাদী পাঠের বিকল্পে সফল যৌথ ইতিহাস রচনায় চীন-জাপান-কোরিয়ার ইতিহাসবিদদের প্রায় দশক ব্যাপী বেসরকারি প্রচেষ্টায় লিখিত ইতিহাসের স্কুল-পাঠ্য বই, যার সুফল ঐ তিনটি দেশেই স্বীকৃতি পেয়েছে।

এর সম্পূরক ও সহগামী কাজ Truth and Reconciliation Commission যার সবচেয়ে সফল উদাহরণ ডেসমন্ড টুটুর নেতৃত্বে বর্ণবিদ্বেষ-উত্তর দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা-কালোর হিংসা ঠেকাতে এরকম উদ্যোগ। সম্প্রদায় নির্বিশেষে আক্রমণকারী-আক্রান্ত-হত্যার স্মৃতি বয়ে বেড়ানো এবং দর্শক সকলেই কথা বলবেন, সকলেই সকলের কথা শুনবেন। এই বলা আর শোনার মধ্যে দিয়ে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে বয়ে বেড়ানো হানাহানির মানসিক ক্লেদ থেকে উপমহাদেশের মানুষজন মুক্ত হতে পারেন। এ বাংলা থেকেই এ কাজ এখনই শুরু করা যায় ও উচিৎ। এক বিশাল সংখ্যক মানুষ নির্যাতন, বিতরণের টাটকা স্মৃতি বয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছেন যারা আদতে কিন্তু আগামী দিনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে জ্ঞানে-নির্জ্ঞানে সহজ দাহ্য। বিবিধ কারণে এ বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ এখনও পর্যন্ত বোতল বন্দী করে রাখা গেলেও সংখ্যাগুরুর তরফে তা কিন্তু যে কোন সময় আকাশ ঢেকে দিতে পারে। ’৪৭-উত্তর ও বাংলার মুসলমানকেও নিজ কৃতকর্মের মুখোমুখি হতে হবে, অন্যথায় তারও মুক্তি নেই। দুই বাংলার এমন কিছু মানুষের কথা ধরা যাক যারা কৈশোর কি তারুণ্যে তিক্ত স্মৃতি নিয়ে সীমানা পেড়িয়ে স্থিতু হয়েছেন এবং কালক্রমে ক্লেদমুক্ত হয়ে বাঙালী সত্তায় স্থির হতে পেরেছেন, জাতীয়তাবাদী আখ্যান সমূহ পেরিয়ে দেশ-কাল-জীবনকে দেশ-কালাতীত মানব সভ্যতার প্রেক্ষাপটে দেখেছেন এবং নিজেদের কাজে তার অনস্বীকার্য সাক্ষরও রেখেছেন।

আজ যদি বদরুদ্দিন উমর, হাসান আজিজুল হক, শঙ্খ ঘোষ, মিহির সেনগুপ্ত একসঙ্গে আলোচনা করেন নিজেদের স্মৃতি আর ব্যক্তিগত ক্লেদ মুক্তির ইতিহাস নিয়ে তবে তা পথ দেখানো উদাহরণ হতে পারে যেমনটা কোন Truth and Reconciliation Commission–এর কাছে আশা করা হয়। না, শুধু সফল বা বিখ্যাতরাই নয় অসফল, অখ্যাত, অভাজনদেরও ক্লেদ মুক্তির জন্য এমন কথা বলার, কথা শোনর সুযোগ করে দিতে হবে। এ পথেই উপমহাদেশের মানুষ তার চিরকেলে সাকিন হাটখোলার প্রান্তরে পৌছবে। এই হাঁটেই হবে পড়শির সঙ্গে চির চেনা জানা, ঘুচবে অপরিচয়ের ‘যম যন্ত্রণা’।

এখানে আরও একটি তাৎপর্য পূর্ণ বিষয় এখনই নজরে নেওয়া দরকার। উপমহাদেশে আধুনিক রাজনীতি চিরকাল ধর্মের সঙ্গে নির্বিবাদ সহাবস্থান করেছে, গান্ধীকে বাদ দিলে সকলেই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যাবহারে সেই স্বাধীনতা আন্দোলন কাল থেকেই ক্রম সিদ্ধ। ঐক্যমূলক দ্বন্দ্বে ভোগা শিবিরে বিভক্তদের আর এক অসামান্য মিল ভোট কুড়নোর ব্যাবহারিক দক্ষতা অর্জনে যত নিরলস, নিষ্ঠ প্রাণ; স্বাধীন সমাজতত্ত্ব, দর্শন চর্চায় ঠিক ততটাই নিষ্ঠ উদাসীন এবং এ প্রশ্নে কারোর ধারাবাহিকতার অভাব নিয়ে কোন অভিযোগের অবকাশ নেই। ভারতীয় রাজনীতির এ একরকম ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ চরিত্রই বটে। ’৪৭-উত্তর উপমহাদেশে যত দিন গেছে ঐ শিবিরে বিভক্তরা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মকে আরও স্পর্শকাতর বিষয় জ্ঞানে প্রকাশ্যে এড়িয়ে গেছেন, বাকিরা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যাবহারে তত সিদ্ধ হয়েছেন। ফলে যা দাঁড়িয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষরা ধর্ম নিয়ে কথা বলতে নিজেদের অক্ষম করে তুলেছেন আর হিন্দুত্ব ধর্মকে রাজনৈতিক সমাবেশের সফল মতাদর্শ হিসাবে ব্যাবহার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম নিয়ে তাত্ত্বিক চর্চায় এত উদাসীন কেন? আরও যা গুরুত্বপূর্ণ এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের কোনরকম আলোচনা, সমালোচনা প্রকাশ্যে করেন না – তাৎক্ষনিক সাম্প্রদায়িকতার তকমা নিশ্চিত। এ কথা বিশেষভাবে মুসলিমদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। এটাই মান্য রীতি। কেন?

কিছুকাল আগেও এদেশে হিন্দু ধর্মের সমালোচনার, বিরোধিতার যে চল ছিল তা আজ প্রায় অতীত। কিন্তু এদেশে ইসলামের কোন তাত্ত্বিক চর্চা, সমালোচনার ন্যূনতম সংস্কৃতি তৈরি হয়নি যা মুসলিমদের বিপক্ষেই গিয়েছে, তাদের ধর্ম নিয়ে স্পর্শকাতরতা দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েছে। এ মুসলিমদের সেই পুরনো পরিচিতি রাজনীতির একই সঙ্গে কার্য ও কারণ, তাকে জোরদারই করে গেছে। '৬০ দশকে ও-বাংলায় বামপন্থী কর্মী স্বদেশ বোস আর নুরজাহানের বিবাহে পার্টি প্রবল আপত্তি করেছিল – দাঙ্গার আশঙ্কায়। '৯০ দশকে তসলিমা-না-পড়া অবাঙালী মুসলিমদের রাস্তায় টায়ার পোড়ান বিক্ষোভে সাড়া দিয়ে বাম বাংলা তসলিমা নাসরিনকে মাঝরাতে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদায় করেছিল। আধুনিক বাঙালীর মৌলবাদের প্রশ্রয় তার আধুনিকতারই সমসাময়িক, প্রকৃত প্রস্তাবে তার আধুনিকতা একরকম ধর্ম নিরপেক্ষ মৌলবাদ এবং যথারীতি পশ্চিমের পাঠ মিলিয়ে।

৫০-৬০ এর দশকে ডেভিড ম্যাকাচ্চন বিশ্বভারতীতে পড়াতে এসে দু-বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে চার হাজারের উপর মন্দির-মসজিদের ছবি তোলেন। গ্রামের মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলে এসব মন্দির-মসজিদের ইতিহাস, স্থাপত্য শৈলী বোঝার চেষ্টা করেন। ওর অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ 'ধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নেই'। বাংলার কোন গ্রামের সম্পর্কে তা মনে হয় অত নির্দ্বিধায় আজ আর বলা যাবে না। এই পরিস্থিতির জন্যে শুধু রাজনীতিকরা নয়, নির্দলীয় ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ ও তার বুদ্ধিজীবীদেরও অবদান আছে।

আজ প্রকাশ্যে সব ধর্মের সব আকর গ্রন্থগুলির আলোচনা, সমালোচনা একান্তই জরুরী। ধর্ম নিয়ে উদাসীন থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার রাজনীতি কতদূর ফাঁপা, আত্মঘাতী, শেষতক মৌলবাদের কাছে অত্মসমর্পণে বাধ্য তা কিন্তু মৌলবাদীরা অতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রতিটি ধর্মের তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া, ধর্মকে প্রশ্ন করতে পারার ক্ষমতা ছাড়া সংবিধান পোষিত ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির কলকব্জা কি বুলি দিয়ে মৌলবাদ ঠেকান যায় না। একাজ শুধু ধর্মের ঐ তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ কি ধর্মকে প্রশ্ন করার মধ্যেই আটকে থাকার নয়। সাকিন হাটখোলার পথে নিম্নবর্গের মানুষজনের ধর্ম-চেতনা, জীবনযাপনও চর্চার বিষয় হওয়া দরকার, তাদের প্রত্যহিকেই সীমানা পেরনো সজীব, স্বভাবজ উদারতা আজও কিছু স্বাভাবিক বলে গণ্য ও মান্য।

এক চামারের হিন্দ স্বরাজ অথবা অননুমোদিত নৈরাজ্য

'আর কত লাল পাড় শাড়ি আর নরম বুক
আর হাওয়ায় গল্ডফ্লেকের গন্ধ
আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
হে মহানগরী'

আমাদের আধুনিক রাজনীতির বয়স কত হল? দরবারি কানাড়া ধরলে ১২৫, পথে নেমে বিরোধিতা ধরলে ১১৫, হিন্দুত্বের বয়স ৯৫, বামেদের বয়স নিয়ে ওদের মধ্যেই একাধিক মত তবে কোন শিবিরের মানসিক বিকাশ যে মহামতি স্তালিনের মহাপ্রয়াণের পর এগোয়নি তা নিশ্চিত, আর স্বাধীনতার বয়স ৭৩। মাঝরাতে নিয়তির অভিসারে যাত্রা করা নেতারা কথা দিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রে পৌঁছবো – উন্নতি সবার হবে 'মরুভূমি বৃক্ষ হবে'। পেলাম জাতপাতে অটল থাকা ভারত, সাম্প্রদায়িকতায় দীর্ণ ভারত। কালক্রমে তিনিটি জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা যেন নাছোড় নিয়তি। উন্নয়নের নামে সীমাহীন নির্লজ্জ বৈষম্য, বাণিজ্য অবাধ করতে প্রকৃতি নিংড়ে ধন উৎপাদন স্বাভাবিক বলে গণ্য হওয়া, জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রের হাত ধরে অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অবিরত

রক্তপাত। পশ্চিমি আধুনিকতার এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিশীল সম্ভাবনা মার্ক্সবাদের এদেশে কোন সৃষ্টিশীল চর্চা কি ফলিত রূপ যে দেখা গেলনা তা মূলত বর্ণ হিন্দুর সেই অগ্রগামী অংশের স্বভাবজ স্তালিনপরায়নতার কারণে। অচিরে ওদের দ্বিজত্বের কোন সম্ভাবনা নেই তা একপ্রকার নিশ্চিত। তা ছাড়া লেনিনিয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান কি চেয়ারম্যান সাহেবের লং মার্চ শেষতক স্বৈরাচারের রকমফের হয়ে শেষ হয়েছে, উপরি পাওনা বৈষম্যের অর্থনীতির প্রসার যাকে ঘোচাতে গিয়েই নাকি এসব রক্তাক্ত উদ্যোগ। তা ছাড়া এমন সব উদ্যোগ আজ অতি সহজে দমন যোগ্য। তবে আজ উপমহাদেশ জুড়ে মৌলবাদের উত্থানের মুখে ছাই দেবার রাজনীতি কি হতে পারে?

তবে কি পথ গান্ধীর এনলাইটেড অ্যানার্কি যা উনি বিস্তারে ব্যাখ্যা করে, পরিচ্ছন্ন মতাদর্শের চেহারা দিয়ে যাননি? উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদে প্রথম ফাটল দেখা দেয় সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর স্বার্থ, অধিকার নিয়ে। আপাত ধর্ম নিরপেক্ষ এই শব্দ বা ধারনা যুগলের মধ্যে এক গভীর তাৎপর্যের স্বীকৃতি ছিল যা আজও প্রাসঙ্গিক। ভারতে মুসলিম কি হিন্দু কেউই সমসত্ত্ব সম্প্রদায় ছিলনা, এমনকি ধর্মীয় আচার আচরণেও নয়। এক সুতোয় ঝোলা ধর্ম বিশ্বাসের ঐক্য ছাড়া দুই সম্প্রদায়ই ভাষা-সংস্কৃতি-খাদ্যাভ্যাস-পোষক-অর্থনীতি বাবদ আঞ্চলিক স্তরে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ছিল, কাররই কোন একমাত্রিক পরিচয় ছিলনা। সুতোয় ঝোলা ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধুনো দিয়ে দিয়ে দিয়ে জাতি পরিচয়ের একমাত্র অভিজ্ঞান করে দেশভাগ হল, এবং তা যে কত অসার ছিল ও-বাংলার স্বাধীন উত্থানে তা প্রমাণ হল মাত্র ২৪ বছরের মাথায়।

এখন উপমহাদেশ জুড়ে সংখ্যালঘু সত্তার রাজনীতি ফিরিয়ে আনলে সব রঙের মৌলবাদকে কি এক সমাধানহীন চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলা যাবে না? অবশ্য আজ এই সংখ্যালঘু সত্তার মধ্যে ধর্ম থেকে যৌন সব ধরনের পরিচিতি সত্তাকে ধারণ করতে হবে। এই রাজনীতির সূত্র ধরে কিন্তু উপমহাদেশ জুড়ে এক সাতরঙা ঐক্য আর বৈচিত্র্য সহিষ্ণুতা তৈরি হতে পারে যে ঐক্য ও সহিষ্ণুতার চর্চা না ধর্ম নিরপেক্ষ না বামেদের রাজনীতিতে কোন গ্রাহ্য বিষয় যদিও তা নির্বাচনী প্রচারে কখনো বাদ পরে না। এই রাজনীতির ফলিত রূপ হিসাবে ধরা যাক এ-বাংলায় কোন গণতান্ত্রিক মোর্চায় সামিল হয়ে বা গঠন করে সংখ্যালঘুরা সোচ্চার হচ্ছেন ও-বাংলায় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বিতরণের বিরুদ্ধে এবং ওপাড়েও যদি একই ঘটনা ঘটে তবে দুপাড়েই কি মৌলবাদ একই সঙ্গে থমকে যাবে না? মৌলবাদের রাজনীতিতে এরকম কোন চ্যালেঞ্জ সামলানোর দিশা কিন্তু নেই। এই রাজনীতি কিছু অসাংবিধানিক বা অগণতান্ত্রিক নয় এবং অহিংস-ভাবে তা করা যায় ও উচিত। এই রাজনীতি যেহেতু ক্ষমতা দখলের লড়াইও নয় ফলে তাকে প্রথাসিদ্ধ কোন অনৈতিকতাকে আশ্রয়ও করতে হবে না ফলে সব রাজনৈতিক শিবিরের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিকে প্রশ্ন করার নৈতিক অধিকারও তার থাকবে এবং মানুষ স্পষ্টতই অন্যদের থেকে এই রাজনীতিকে আলাদা করতে পারবে। ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য অন্য দুই জাতি-রাষ্ট্রের থেকে অনেক পোক্ত তাই ভারত থেকেই, বিশেষত এই বাংলা থেকেই তা শুরু হতে পারে এবং উচিৎও বটে। প্রকৃতপক্ষে এ-বাংলার সংখ্যালঘুদের সে দায়ও আছে, কারণ যতই সে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ভাবে প্রান্তিক (যা কিছুটা স্বোপার্জিতও বটে) হোক না কেন ও-বাংলার সংখ্যালঘুদের মতো নিয়ত উচ্ছেদের আতঙ্কের আবহে তাকে বাঁচতে হয় না।

এই সংখ্যালঘু সত্তার রাজনীতির সূত্রে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা নিয়ে কনফেডারেশনের দাবি করা যাবে যার ফলে ভিসাহীন সহজ যাতায়াত, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো সরল অর্থনৈতিক কাঠামো শিল্প-

বাণিজ্য প্রসার ঘটাবে, সাংস্কৃতিক ও অ্যাকাডেমিক বিনিময় সহজ হয়ে অপরিচয়ের দূরত্ব ঘোচাবে, আরও যা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অপরের প্রয়োজন পরবে না, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হবে, বাড়বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়। মিনু মাসানি এই উপমহাদেশ-জোড়া কনফেডারেশনের প্রয়োজনীয়তা অনেককাল আগেই বলেছিলেন যা প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম নিরপেক্ষরা মূল্য দেয়নি কিন্তু আজ তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আগে যে ব্রত ধর্মীতার কথা সেই সুত্রে আরও একভাবে অহিংস পথে (এটা খুব জরুরি – একে পাশ কাটিয়ে যাওয়া আত্মঘাতী হবে, অনৈতিক হবে) জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্রকে হেনস্তা করা যায়। যদি আমরা গান্ধী-তুল্য সততা স্বচ্ছতা সবাই সবার কাছে দাবী করি ও পালন করি এক রকম ব্রত হিসাবে তবে জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্র তার আইন, আদালত, প্রশাসন নিয়ে সমাজ জীবনে অনেক দূর পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজই তখন রাষ্ট্রকে চালনা করবে, এটাই তো কিছু দিন আগে পর্যন্ত মানুষের ঈপ্সিত লক্ষ্য ছিল।

এর অসম্ভবতা নিয়ে যে যুক্তি তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য, প্রকৃত প্রস্তাবে সে কারণে গান্ধী ভারতীয় সহ সব সমাজে নমস্য এবং পরিত্যাজ্য। অমন সততা, স্বচ্ছতা দিয়ে আধুনিক বিধি, ব্যবস্থা চলে না। এতে সমাজ জুড়ে অ্যানার্কি দেখা দেবে। অতি সঠিক কথা। এখন অবিরাম প্রকৃতি নিংড়ে, বৈষম্যের পাহাড় গড়ে, সামগ্রিকভাবে পৃথিবীকে খাদের ধারে নিয়ে আসার বিধি, ব্যবস্থার নাম যদি হয় সভ্যতা তবে তার বিপরীতে এমন সততা, স্বচ্ছতা জাত নৈরাজ্যই তো মানবিক, কাম্য হওয়ার কথা। তর্কাতিত ভাবেই কঠিন বিকল্প এবং কবির ব্যঙ্গ হলেও সত্য যে এর কোন পরিশ্রম নেই, যা দরকার তা হল নিজেকে ঢেলে সাজাবার কষ্টকর যাত্রায় স্থির থাকা।

কিন্তু এই তো সব নয় আছে নির্বিকল্পতার দাবী নিয়ে পুঁজিবাদ যার উত্তর হতে গিয়ে মার্ক্সবাদ দেশে দেশে রক্তাক্ত স্বৈরাচারের সমার্থক হয়ে গেছে। এ বাবদ বোঝাপড়া ও প্রয়োগের সৃজনশীলতার অভাব ছাড়াও দর্শনটির নিজস্ব অনুদার একগুঁয়েমিও দায়ী। এখানে প্রায় চিরকালীন এক সমস্যা ফিরে দেখা দরকার। নিপীড়িতের মুক্তির আশ্বাস দাতা সমস্ত মতাদর্শ ও তদাশ্রয়ি সংঘরা যেন প্রাকৃতিক নিয়মের মতো শেষাবধি হয়ে উঠেছে নিপীড়িতের আর এক শাকের আটি। কেন? মতাদর্শের চরিত্রের প্রশ্নে আশীষ নন্দীর বক্তব্য আজ বিবেচনার দাবী রাখে। ধারনাটির মধ্যেই চরিত্রগত-ভাবে এমন কিছু কি আছে যা সংঘের সহায়ক হলেও ব্যক্তির জন্য অনুদার দাবি মেটানোর বাধ্যতা নিয়ে আসে ফলে ক্ষমতার ধারনা লুপ্ত হবার বদলে তা ক্রমাগত কুক্ষিগত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রকেও করে তোলে অ-সংবেদনশীল, পরিণতিতে আত্মঘাতী? এ অবস্থায় সংঘে একলা হয়ে যাওয়া মানুষ যদি একলা পথে সংঘকে টের পেতেই থাকে তবুও কি সে সংঘ বিমুখ হয়ে পরবে না? তবে কি সমাজ, সংঘকে শিরোধার্য করে ব্যক্তিকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে সংঘের বাইরে? সন্ন্যাস কোন উত্তর না হলে, লিপ্ত থেকেও অবিবাদি মুক্ত থাকার পথ কি? আজ চরিত্রগত ভাবে যে কোন মতাদর্শকে নিঃশর্তে ব্যক্তির আত্মতা বিকাশের কি সৃজনশীলতার পথ খুলে দিতে হবে। চরিত্রগত ভাবে মতাদর্শের পক্ষে এ যদি হয় সোনার পাথর বাটি, অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য যদিও তেমনটাই বলে, তবে বিকল্প জীবন দর্শনের কথা ভাবতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্ব কি আজ মধ্য ও নিম্ন বর্গের মানুষের সামনে ধর্মীয় উন্মত্ততা প্রসারের জন্যে এমনই সৃজনশীলতার পথ নিরন্তন খুলে দিচ্ছে না, যদিও তা মূলত সরকারি ক্ষমতাবলে?

'৪৭-এ ভারতের মধ্যবিত্ত যত প্রশ্নশীল ছিল আজ আর তা নয়। যাবতীয় অন্যায়, দুর্নীতির সে আজ নির্দ্বন্দ্ব শরিক, 'পণ্যের মালিকানা দিয়ে সত্তা তৈরিতে' নির্দ্বিধ ও দড়। বিকল্প মতাদর্শের আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতা মধ্যবিত্তকে পণ্য

সংস্কৃতিতে জড়িয়ে নিতে পারাই পূঁজির সবচেয়ে বড় জয়। পূঁজি কৌম সত্তাকে গিলে ব্যক্তি সত্তাকে সার্বিক মুক্তি দিয়েছে তাকে স্বাধীন মজুরী শ্রমিক আর ভোক্তা করে। অনস্বীকার্য এপথে সে সদর্থক কিছু অর্জনও করেছে, যথা চিরকালীন বলে গ্রাহ্য সবকিছুকে প্রশ্ন করতে পারা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নে সোচ্চার হওয়া ইত্যাদির মতো দরকারি চিত্ত। কিন্তু তার সব অর্জনই বিচ্ছিন্নতার মূল্যে এমনকি তার প্রজাতিগত সত্তা থেকেও সে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে। পুঁজির কালে এই যদি তার নিয়তি হয় তবে প্রজাতি সত্তায় ফেরার পথ নিশ্চিত ভাবেই পণ্যের মালিকানা দিয়ে ব্যক্তি সত্তা তৈরিতে নারাজ হওয়া। এবং এ কোন ভাবেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান কি লং মার্চের দ্বারা সম্ভব নয়।

আজ পুঁজির সমাধানে যত না তার থেকে ঢের বেশী মার্ক্স প্রাসঙ্গিক পুঁজির বিশ্লেষণে; পুঁজির অনিবার্য অস্থিরতা, নিয়ত নৈরাজ্য এবং তা আরও বড় নৈরাজ্য দিয়ে ঠেকানো, উৎপাদন সম্পর্ক-জাত মানুষের প্রজাতিগত সত্তার ক্ষয়, ‘পণ্যের মালিকানা দিয়ে সত্তা তৈরি’, ফলে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা শেষ হয় ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের বিচ্ছিন্নতায়, প্রজাতি সত্তা হারিয়ে সে নিছকই কিছু পণ্যের মালিক অথবা তেমন পণ্যের মালিকানা অধরা থেকে যায় বলে সে তখন নিতান্তই মজুরি শ্রমিক তথা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির কলকব্জা, পুঁজির পুনরুৎপাদনের বেড়ে চলা সঙ্কট, তাকে নিরন্তন আরও উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা, সম্পদের অনিঃশেষ কেন্দ্রীভবন ইত্যাদি মার্ক্স চিহ্নিত পুঁজির প্রধান সমস্যাগুলো আজও তার নাছোড় শর্ত। সমাধান খুঁজতে গিয়ে উনি কিন্তু ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের ক্রমান্বয়ে উন্নয়নবাদের চৌকাঠে আটকে থাকলেন। এমনকি অন্যদের মত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সদর্থক উন্নয়নমূলক দিকও খুঁজে পেলেন। বলা যায় ঈশ্বরের জায়গায় ইতিহাসকে বসালেন যেন ইতিহাস নির্দিষ্ট সমাজ বিবর্তনের সিঁড়ি মানুষের নিয়তির মত অপেক্ষা করছে, ঠিকঠাক সিঁড়ি ভাঙলেই সব অসাম্যের চির অবসান। দেশে দেশে এমন সিঁড়ি ভাঙা, তিমির বিনাশী বিপ্লব সকলের পরিণতি নিয়ে আজ তর্কের কোন অবকাশ নেই, তবে অনস্বীকার্য এদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ ও দায় রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ওর সময়ের ইউরোপ পৃথিবীর দেশে দেশে নিজ সৃষ্ট সভ্যতার স্ব-নিয়জিত যোগানদার হয়ে উঠেছিল, আজ তা দেশে দেশে সভ্যতার পথনির্দেশ ও মানদণ্ড ঠিক করে চলেছে। সমসত্ত্ব উন্নয়নবাদের চক্রে মানুষ আজ হা-ক্লান্ত, সৃজনশীলতা-হীন এবং নিরন্তন আত্মঘাতী, পৃথিবীই আজ ধ্বংসের কিনারে। এখন পুঁজি ও তার সাগরেদ জাতি-রাষ্ট্রই যদি মানুষের নির্বিকল্প ভবিতব্য হয় তবে আহার নিদ্রা মৈথুনে মানুষকে থামতে হয়, যদিও তা সকলের জন্য সম্ভব হয়না। আজও মানুষের প্রধান সঙ্কট-বোধ যতদূর বৈষম্য-জাত তার থেকে ঢেঁড় বেশি তার প্রজাতিগত সত্তার ক্ষয় বোধ থেকে।

ইতিহাসের ব্যক্তিদের গড় করে ভিন্ন পথের সন্ধানে যেতে হবে। এখনও পর্যন্ত সব উন্নয়নবাদই সম্পদ বণ্টনের রকমফেরে কমবেশি বৈষম্য দূর করার চেষ্টা যা শেষ পর্যন্ত পণ্য সংস্কৃতির, পণ্যের বাজার প্রসারের কাজেই স্থির থেকেছে। ব্যক্তি আজ এতদূর কৌমচ্যুত তার স্বাতন্ত্র্য বোধ এতদূর শক্তিশালী যে সে ‘একলা বাঁচার প্রেম নিয়ে’ বাঁচার কথা ভাবতে পারে, লোক ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকেই নিজে বিয়ে করে। এসব যদি ব্যক্তির আত্মরতি না হয়ে বিচ্ছিন্নতার আত্তীকরণ হয় তবে তার কাছে ব্যক্তিগত স্তরে কিছু কি দাবি করা যায়? কোন ব্যক্তিগত প্রতিরোধ, প্রত্যাখ্যান তো তার পক্ষে অসম্ভব হওয়ার কথা নয়।

এমনই এক ব্যক্তিগত প্রত্যাখ্যানের এ কাহিনী আশীষ নন্দী শোনেন তার বন্ধু রবি মাথাইয়ের কাছে। রবি মাথাই '৭০-এর দশকে আই আই এম আমেদাবাদের প্রধান ছিলেন এবং একটি অসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালনা করতেন। সংস্থাটি রাজস্থানের জাযজা জেলায় এক গ্রামে চর্মকার গোষ্ঠীর উন্নয়নের কাজে জড়িত ছিল ('৭৫)। তাদের আধুনিক কৃতকৌশল শিখিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, দরকারি সরঞ্জাম দেওয়া, বাজারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার কাজ করছিল। গ্রামের সব চর্মকার এই প্রকল্পে যোগ দেয় এবং অচিরে তাদের প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু একজন স্বেচ্ছায় রয়ে গেলেন এর বাইরে। কেউ তাকে হাজার বুঝিয়ে, তার গ্রামেরই অন্যদের উদাহরণ দেখিয়ে প্রকল্পে যোগ দেওয়াতে পারল না। শেষে রবি মাথাই নিজে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেন, সবিস্তারে বোঝালেন, এমনকি তার ভাইয়ের উন্নতির উদাহরণ কিছুই সেই চর্মকারকে টলাতে পারল না। শেষে হতাশ রবি মাথাই বললেন 'জান সবাই তোমার পেছনে কি বলে? সবাই বিংশ শতাব্দীতে বাস করে আর তুমি আঠেরো-শো শতকে বাস করে। সবার থেকে দুই শতক পিছিয়ে আছো'।

চামারের ছিল সহজ উত্তর, 'জানি আমার ভাইয়ের আর সবার খুব উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তুমি দেখেছ ওদের সবার খরচ বেড়ে গেছে, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা বেড়ে গেছে। ওরা সকলে আরও বেশি অসুখী। ওরা তো ঠিক করেনি ওরা কোন শতাব্দীতে বাঁচবে – তোমরা তা ঠিক করে দিয়েছো। কিন্তু আমি ঠিক করবো আমি কিভাবে বাঁচবো, কোন শতাব্দীতে বাঁচবো'। রবি মাথাইয়ের কোন উত্তর ছিল না। সেই গ্রাম্য আনপড় চামার কিন্তু নিজস্ব সংবেদনশীলতায় উন্নয়নের অন্য মুখ ঠিক চিনে নিয়েছিল – সচ্ছলতার মূল্যে জীবন জুড়ে উদ্বেগ, খরচ বেড়ে যাওয়া, তা সামলানোর অনিশ্চয়তা আর এক নিটোল অসুখী জীবন, বিপরীতে 'অনুন্নয়নের' প্রশান্তি ঢেঁড় ভালো, তা নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি কি বাজারের হাতে তুলে দেয় না। জীবন ও গন্তব্য শেষতক থেকে নিজ নিয়ন্ত্রণে। গান্ধী এরকম গোত্রর 'বস্তু বিরল' জীবনবোধের কথাই ওর হিন্দ স্বরাজে বলতে চেয়েছেন যা নিজের কালেই পিছুটান হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং যার কোন শব্দই গান্ধী বদলাতে অস্বীকার করেছিলেন।

এখন সব উন্নয়নই যদি পুঁজির বাজার প্রসার হয়ে দাঁড়ায় তবে এই একগুঁয়ে গ্রাম্য চামারের মত তার শরিক হতে প্রত্যাখ্যান করা কি কোন সুস্থায়ি সাম্যমূলক বিকল্পের পথ খুলে দিতে পারে? যেমন ধরা যাক সকলে ব্যক্তিগত ভাবে জীবনে ভোগব্যয় ন্যুনতমে নিয়ে আসলে, প্রযুক্তির অগ্রাধিকার বাজার নয় ব্যক্তি ঠিক করলে ব্যবস্থার মধ্যে কি এক কাম্য বিপর্যয়, তার অচেনা নৈরাজ্য দেখা দেবে না? এমন ব্যক্তিগত অহিংস, অসম্মতির মোকাবিলার কোন কৃতকৌশল আদতে কিন্তু সম্ভব নয়, এক আদি রিপু লোভকে সুড়সুড়ি দেওয়া ছাড়া। এমন কোন এনলাইটেড অ্যানার্কি বিশ্বজোড়া পুঁজির হিংস্র বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাম্য অহিংস সাম্য নিয়ে আসতে পারে। অন্তত তার সম্ভাবনা কি যাচাই করা যায় না? আজও বাজার ও ব্যবস্থা বিরোধী এমন কোনো অহিংস প্রত্যাখ্যানের ব্যক্তিগত ব্রত ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে খুলে দিতে পারে উৎস মুখ – সাম্য আর সৃজনশীলতার। উপনিবেশের কালে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর স্বদেশ চেতনায় সামাজিক ভেদাভেদর হিংস্রতা, 'উন্নয়নের' অনিবার্য বৈষম্য ঠেকাতে এমন নিচ থেকে অহিংস প্রত্যাখ্যানের দিক-দিশা রয়েছে। উপনিবেশের কালে ওদের স্বদেশবোধ, সৃজনশীলতার উৎস ও আজও তার টিকে থাকা তাৎপর্য বুঝে নিয়ে নতুন এবং বিকেন্দ্রীক রাজনীতি সৃষ্টি করতে না পারলে আধুনিকতা আর জাতীয়তাবাদের অতিমারি আমাদের নিয়তি।

এই ব্যক্তিগত অহিংস অসম্মতি, অসহযোগ পুঁজির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় এবং নিশ্চিতভাবে সুস্থায়ি উত্তর হতে পারে। কারণ এ কোন কতিপয়ের পরিচালনায় রক্তাক্ত বিপ্লব পূর্বক রাতারাতি ব্যবস্থার পরিবর্তন নয় ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং ক্ষমতাবানের সহায়ক নৈরাজ্য দেখা দেবে না। এই অসম্মতি অসহযোগ কোন উপর থেকে চাপানো অনন্ত পাঁচশালা উন্নয়ন পরিকল্পনা নয় যা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে 'সম্ভব' এবং দুর্নীতির পোষক। এ পথে প্রকৃতপক্ষে কোন কেন্দ্রের আদতে প্রয়োজনই নেই। ব্যক্তি অথবা ছোট ছোট গোষ্ঠী নিজেদের বিবেচনা মত পণ্য ও প্রযুক্তি চালিত উন্নয়নকে অস্বীকার করে এক বিচিত্র আর মানবিক নৈরাজ্যের জন্ম দিতে পারে। এ পথ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সহায়ক ও তাদের ক্রম প্রসারিত অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ সুস্থায়ি এক বিকল্প ব্যবস্থার ক্রম উদ্ভব হতে পারে। চরিত্রগত-ভাবে জোড়াল স্থানিক বৈচিত্র্য পথটিকে নির্মাণ করবে, দেখা দেবে এক কেন্দ্রহীন সমাজ-সংস্কৃতি-উৎপাদন-মালিকানার বহুবর্ণ মোজাইক। ইতিহাসে পুঁজি ও আধুনিকের আগমনের আগে পর্যন্ত এমনটাই তো ছিল সভ্যতার চরিত্র ও গড়ন। আরও যা এ কোন 'দাও ফিরে সে অরণ্য' রোদন নয়, এ শুধুই পণ্য দিয়ে সত্তা তৈরিতে অস্বীকার এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও অগ্রাধিকার বাজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে তার দাসত্ব করা নয়। এই কেন্দ্রহীন নৈরাজ্যমূলক প্রতিরোধই আনতে পারে কোন কাম্য, অহিংস, সুস্থায়ি, সাম্যময় বিকল্প। এমন কেন্দ্রহীন নৈরাজ্যমূলক প্রতিরোধের জন্য বাজার ও ব্যবস্থা-উদাসি, যশ-প্রতিষ্টা-অমরতাকে শুকরি বিষ্টা জ্ঞানে, বস্তু বিরল জীবন যাপন করা মানুষ (এসব কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ সাধনের জন্য নয়, বরং গান্ধারীর মত 'ধর্মেই ধর্মের শেষ' জেনে) – চরম রক্ষণশীল থেকে উদার আধুনিক – সব শিবিরেই ছিল, আজও আছে ক্ষীণ যদিচ স্বছতোয়া।

আজ এসব অসম্ভব, দিবাস্বপ্ন, বাতুলের প্রলাপ? তবে বরং স্থিতধীর মত স্থির থাকা যাক, সময় আসলে ঠিক বোতাম টিপে শাসক বদলে দেবার স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসে, 'নাই বা হল আমার পাড়ে যাওয়া', আমরা তো অনেক দিন অভ্যস্ত হয়ে গেছি 'পেস্তা চেরা চোখ মেলে শেষহীন নারী ধর্ষণের কাহিনী পড়ায়', অভ্যস্ত হয়ে গেছি 'বনিকের পিঙ্গল প্রহারে'। শুধু যা মাঝে মধ্যে করোনার উৎপাত সাম্যের ভোগান্তি আনবে, ওঠিক সামলে নিয়ে ফের বৈষম্যের সমে এসে দাড়িয়ে যাবো যথাপূর্ব স্বচ্ছন্দে।

উপমহাদেশ আজ অনেকদিনর রেসের মাঠ। আসুন খবর হবার চেষ্টা করি – সমবেত শপথ নি আগামী ২৫শে বৈশাখ কি দোসরা অক্টোবর (এ উপমহাদেশে ঐ দুটোই ধর্ম নিরপেক্ষ শুভদিন কিনা), অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতা দীর্ঘজীবী হোক, রণ-রক্ত-সফলতা দীর্ঘজীবী হোক।

'আমরা তো অন্যরকম' বর্ণ হিন্দু বঙ্গ জনের এ প্রাচীন আত্মশ্লাঘার দিন শেষ। 'ক্রমে (হিন্দুত্বের) আলো আসিতেছে', দেওয়াল লিখন অধুনা পাঠযোগ্য হতে সামান্যই বাকি। সুধীজন ত্রস্ত বটে অভ্যাস-জনিত, তথাপি দ্রুত-পাঠ সেরে নেয় 'সাম রাজ্য/ কং রাজ্য/ বাম রাজ্য/দেখলি একে একে/বাকি ছিল রাম রাজ্য/ঠিকই যাবি দেখে' (অন্নদাশঙ্কর রায়কে সামান্য বদলে)।

আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষ মৌলবাদ – একটি সংক্ষিপ্ত পাদটীকা

বাঙালি বামুন-কায়েত-বদ্যি পুরুষের সব সদ গুন, যথা, নীচতা, ক্রুরতা, প্রতিশোধ পরায়ণতা, শঠতা, লোভ ও ক্ষমতার জন্য অনৈতিকতা, তীব্র অসহিষ্ণুতা, কূপমণ্ডুকতা, দ্বিচারীতা, হিংসা ছাড়া সৃজন-সামর্থহীনতা, অন্যের প্রশ্নশীল সৃজনশীলতা দেশের ও দলের ভালোর নামে দমন করার ক্ষমতা, শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খলপরায়নতা, গোপন লাম্পট্য ইত্যাদি মহর্ষি স্তালিনের মানবিক গুনসকল যারা মতাদর্শ রূপে ধর্মীয় নিষ্ঠায় ধর্ম নিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার নামে পালন করেন তাদের স্তালিনপরায়ন বলে। তাদের চরিত্রের নাম তখন স্তালিনপরায়নতা। এই সকল গুনের একত্র নাম স্তালিনতা, যার হাত থেকে এদেশের কোন বামেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। এই ধর্ম নিরপেক্ষ স্তালিনপরায়নতা বাঙালি বর্ণ হিঁদু সুধী জনের নিজস্ব সৃজনশীল মৌলবাদ। অনস্বীকার্য এ সব গুন বর্ণ হিন্দুর একচেটিয়া নয়, কিন্তু মহর্ষি স্তালিনের এসব মানবিক গুনের সঙ্গে তার চরিত্র ও নৈতিকতার সাযুজ্যের কারণেই কি বর্ণ হিন্দুর বামপন্থা সকল প্রশ্ন-হীনভাবে স্তালিনপরায়ণ?

স্তালিন-ভক্ত বা পার্টি সর্বস্ব কিন্তু কিছু মাত্র স্তালিনপরায়ণ নয় এমন মানুষ সব দলে সামান্য হলেও ছিলেন, ব্যতিক্রমহীন ভাবে তারা কেউই নেতা নন যদিও পার্টি বা পরার্থে নিবেদিত প্রাণ এবং তা নিঃস্বার্থে। শুরুতে স্থানীয় স্তরে এরা সংখ্যা গুরু হলেও ক্রম বিলীয়মান প্রজাতি হয়ে প্রায় '৭০-এর গোড়া পর্যন্ত টিকে ছিলেন। ঠিক একই ভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মহল্লায় কথায়-কাজে, জীবন যাপনে যারা গান্ধী অনুগামী তারা চির-প্রন্তিক। আমাদের রাজনীতি ও দলীয় কাঠামোর মধ্যে এমন কিছু ছিল এবং আজও আছে যাতে এই মানুষেরা চিরকাল সমানভেবে প্রান্তিক থেকে গেলেন – সমাজে ও দলে।

সব কিসিমের বঙ্গ বামেরা '৭০-এর দশক পর্যন্ত এবঙ্গে টিকে থাকা মূলত বর্ণ হিন্দুর ধ্বংসপ্রায় কৌম সত্তার শেষ অবশিষ্ট উদারতা-আদর্শবাদীতার সুফল ভোগ করেছে, প্রতিদান বলতে হিংসার প্রসার ও তার প্রাতিষ্ঠানিকতা। উত্তর-আধুনিকরা এর উত্তরে আধুনিকতার অসুস্থার (pathology of modernity) যে কথা বলেন তা দিয়ে সমস্যার সবটা ধরা পড়ে কি? বরং এভাবেও কি দেখা যায় যে বর্ণ হিন্দুর মন-মানসিকতার সঙ্গে পুঁজির আধুনিকতার চারিত্রগত সাযুজ্য তার সহায় হয়েছিল? সে ক্ষেত্রে পুঁজির উৎপাদন রীতি ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী সংস্কৃতি কে আমাদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রযজোন থাকছে। এদেশে পশ্চিমি ধর্ম নিরপেক্ষ বা 'শ্রেণী-আশ্রিত' স্তালিনপরায়ন রাজনীতি সব ধরনের সংখ্যালঘু সত্তাকে অনেক কাল হল গিলে নিতে পেড়েছে। প্রকৃত পক্ষে সেই সাম্রাজ্যের কাল থাকাই রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী বাদে সব বিরোধীতাই ব্যবস্থা-সহায়ক বিরোধীতা, এটাই এদেশে বিরোধীতার মডেল। সব ধরনের সংখ্যালঘু সত্তার বিরোধীতা, 'শ্রেণী সংগ্রাম' শেষ হয়েছে ব্যবস্থা-সহায়ক ক্ষমতার দাবিতে যা কম-বেশী পেয়ে তারা ক্ষান্ত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর মত স্বদেশী সিদ্ধির উদাহরণ থাকা সত্তেও উপনিবেশের টিকে থাকা রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার অহিংস, সৃষ্টিশীল রাজনীতি, সংস্কৃতি তৈরি হল না কেন? বাঙালির জন্য তার এক নিশ্চিত কারণ দেশভাগ যা নিয়ে আজও বিস্তৃত চর্চা হয়নি এবং যার মূল্য নিত্যই দুপরের বাঙালিকে মেটাতে হচ্ছে।

কখনো উদাসীনতা, বিমুখতা নিখাদ হত্যার নামান্তর। আজন্ম তুমুল আন্তর্জাতিকতার চূড়ামণি বর্ণ হিন্দু বাঙালির গান্ধীর ক্ষেত্রে ভূমিকা এ রকম গোত্রের হত্যাকারীর। আর তার রবীন্দ্র-প্রেম নিখাদ আত্মরতির, কখনো আত্মপ্রতিষ্ঠার, পরাকাষ্ঠা, অন্যদের শিক্ষণীয়। এই দুই ভারতীয় চিরহরিৎ বনস্পতি নিয়ে তার চির উদাসীনতা আর অনন্ত আত্মরতির উৎসে স্তালিনপরায়নতা ছাড়া আর কি আছে? এর সঙ্গে কি কোনরকম সম্পর্ক আছে তার ও-বাংলা নিয়ে উদাসীনতার? আজ ও-বাংলায় মধ্য প্রাচ্যের তুল্য ইসলামি-করণের যজ্ঞ চলছে, তা নিয়ে বিশেষত হিন্দু নির্যাতন, বিতারণ নিয়ে তার

উদাসীনতাকে একরকম হিংস্রতাই বলা যায়। ও-বাংলায় তুমুল ইসলামি-করণ কি হিন্দু নির্যাতন, বিতারণ নিয়ে কথা বলা অঘোষিত ভাবে এ-বাংলায় নিষিদ্ধ, যুক্তি খুবিই স্পষ্ট – হিন্দুত্ব প্রশয় পাবে। দুপাড়ে দেখা হলে '৭১ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ঢেকুর তোলাই একতম রীতি। গত শতকে বিশ্ব মানবের মুক্তি দাতা মহর্ষি স্তালিনের গুলাগ আর গণহত্যা নিয়ে কথা বলা বারণ ছিল, একই যুক্তি – মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সুযোগ নেবে। পরিণতি তামাদি হয়ে শেষে ঐ পুঁজি কোলেই আশ্রয় নেওয়া।

দুপরেই বাঙালি আজ আরো একবার পশ্চিম মুখি – এপারের মক্কা অযোধ্যা, ওপাড়ের কাশী মধ্য-প্রাচ্য। দুপরেই বাঙালি সত্তা বিসর্জনে সে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্বদেশী ইতিহাস-হীন হয়ে আধুনিকতাশ্রয়িতায় এর সম্পূর্ণ ব্যখ্যা হয় না। বরং বর্ণ হিন্দুর মন-মানসিকতায় অটুট থেকে যে ভাবে পশ্চিমি আধুনিকতাকে সে একদা আত্মগত করেছিল তা এক রকম সৃজনশীলতাই বলা যায় (না কি সাম্রজ্যের কাছে হেরে, তার সঙ্গে বাধ্য হয়ে তাল মিলিয়ে নিছক বাইরের প্রলেপ?)। বর্ণ হিন্দু বাঙালি কি বইয়ে লেখা সেই চিরন্তন হিন্দু যে চিরনমনিয় এবং চির-অপরিবর্তনীয়? তা হলে তো তার স্বাভাবিকভাবে আজকের হিন্দুত্বকে উপেক্ষা করার কথা, কিন্তু তা তো হচ্ছে না। তবে কি উত্তর ভারতীয় হিন্দুত্বরে আধুনিকতা বাঙালি বর্ণ হিন্দুর পুরানো আধুনিকতা কে গিলে নিছে? কি ভাবে তা সম্ভব হচ্ছে? আধুনিকতার শামলা গায়ে চড়ানো সময় যে হিংসতাকে সে ক্রমে অস্বীকার করতে শিখে ছিল সেই চাপা পড়া অর্ধ-সত্তা কি আজ ঘরের মাঝে শত্রু খুঁজে মুক্তি পাছে? এক্ষেত্রে কিন্তু দেশভাগ তার সহায় হয়েছে। দেশভাগ ওপাড়ের মুসলমানকে ঠাঁই নাড়া না করেও শিকড় হীন করে দিয়েছে। হিন্দু আধিপত্যে চাপা পড়া তার অর্ধ-সত্তা কি একই ভাবে আজ ঘরের মাঝে শত্রু খুঁজে মুক্তি পাছে? এ-পাড়ে হিন্দু বাঙালির হিন্দুত্ব-প্রশ্রয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ কি স্তালিনপরায়নদের রাজনীতি ছাড়াও তার নিজস্ব আধুনিকতা এক কারণ, যা মৌলবাদের এক রকমফের ছাড়া কিছু নয়। ও-পাড়ে সমাজ জুড়ে তীব্র ইসলামি-করণ কি পশ্চিমি আধুনিকতার কাছে হেরে তার উত্তর হয়ে দেখা দিচ্ছে? আধুনিকতার মৌলবাদকে ধর্মীয় মৌলবাদ দিয়ে ঠেকান? হায়, দুপাড়েই বাবুদের ভাবা প্র্যাকটিস আর হয়ে উঠল না! দুপরেই মৌলবাদের সামনে রিকেটি শিশুর মতো সে, দাঁত ছড়-কুটে পড়ে থাকার আগে মুক্তিযোদ্ধার ছায়ার ভূমিকায়। এছাড়া গতি নেই কোনো?

প্রকাশ থাক ১৯৩৫ সালে এক বাঙালির গান্ধী নিয়ে ভবিষ্যৎবানী তুল্য পর্যবেক্ষণ 'Is Gandhi a nationalist?' He was, after all, more of an internationalist, and more intimately tied to the poor peoples' cause to be a 'nationalist', in the usual sense of the term. But for the sake of India's freedom, there had come about an alliance between the radical Gandhi and the nationalist forces; and as Gandhi became more and more radical in action, the nationalist forces would tend to drop away from his company'. নির্মলকুমার বোসের এই ভবিষ্যৎ বানী সত্য করতে আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধর্ম নিরপেক্ষরা ১৩ বছর সময় নিয়ে ছিল। হায়, শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, প্রাকৃত বাঙালি জনেরও তবে পশ্চিমি আধুনিকতার বাইরে নিজস্ব স্বদেশ চেতনা বলে কিছু ছিল! আমাদের প্রগতির ইতিহাস তবে এই নিজস্ব স্বদেশ চেতনা হারানোর ইতিহাস। আজ আমাদের রাজনীতি তবে এই লুপ্ত স্বদেশ চেতনা পুনরুদ্ধারের ব্রত।

যা হোক ফিরতে হবে শুধু মার্ক্সে নয়, আমাদের ঐ দুই চিরহরিৎ বনস্পতির কাছেও। বনস্পতি বলেই যথারীতি মধ্য ছিল ব্যবধান এবং তা চরিএগত, আরও যা বনস্পতি ও চিরহরিৎ বলেই মৌলবাদের দূষণ মুক্ত। এদের বোঝাপড়া ছাড়া না ধর্মীয় মৌলবাদ না স্তালিনপরায়নতা (যা চরিএে ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক মৌলবাদ ছাড়া কিছু নয়) কোন কিছুর থেকে মুক্তি নেই – না ব্যক্তির না সমাজের। তবে প্রশ্ন থাকে কোন গণ-সমাজের (mass society) পক্ষে (বাদল সরকাররে অসামান্য সংলাপে গণ-সমাজের চরিএ নিখুঁত ভাবে ধরা আছে – সক্কলে করে যা – স-ব্ব-আ-ই করে তাই) আজ কি

এসব দেশ-কাল ছাপানো মানুষদের নতুন করে উপলব্ধি, অর্জন করা সম্ভব? গণ-পরিসরে (public speher) এদের আত্মগত করার পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করাই আজকের রাজনৈতিক সৃজনশীলতা। এ কাজ শুধু নতুন সংঘ নির্মাণে হাবার নয়। ব্যক্তির স্বাধীন দরকারে একাকী ব্রত এক্ষেত্রে প্রাথমিক – ব্রত ভাসাও জলে, এসো ব্রত ভাসাই জলে, আর খেয়াল রাখা যাক একাজে 'কেবলই মেধা নয়, কেবলই হৃদয় নয়'।

'আর সকলে মিথ্যা বলে বলুক
ক'এক জনের কাছে আমরা সত্য চাই
আর সকলে ভ্রান্ত করে করুক
ক'এক জনের কাছে আমরা ব্রত চাই'

সোমনাথ ঘোষ

প্রায় সব উদ্ধৃতি স্মৃতি থেকে, কিছু অমিল সম্ভব।